দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৫ তম সংখ্যা ❖ ১৭ মার্চ ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- গ্রীণ হাউস গ্যাসের নিঃসরণে উজাড় হয়ে যেতে পারে তামাম হিমবাহ ২
- পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই ও উগান্ডা দুহিতা জেনেট ৩
- বদরুদ্দিন উমর এবং বিপ্লবী শুচিবায়ুগ্রস্তিতা ৫
- এই তো আমার চেনা না-চেনা বাংলাদেশ ৬
- শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ ঋত্বিক ঘটক এক অনন্য প্রতিভা ৯
- শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের ধারা ১১
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন ১৩
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলের কথা ১৫
- ট্রাম্পকে কি বললেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ১৬
- নরেন্দ্র মোদীর ডিগ্রি একটা মিথ্যা ঢাকতে হাজারটা মিথ্যা ১৬
- স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ভূমিকা ১৮
- মোদী কি আদানিকে বাঁচাতে ট্রাম্পের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন ২০

➲সম্পাদকীয়

বিরোধী দলের নেতার কুরুচিপূর্ণ ঘৃণা ভাষণ

অতি সম্প্রতি বিধানসভায় বিরোধী দলের তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ভাষণে বলেছেন ২০২৬ সালের নির্বাচনে যে সকল মুসলিম নির্বাচিত হবে তাদের বিজেপি চ্যাংদোলা করে সামনের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। শ্রী অধিকারী এখানেই থামেননি। তিনি জানিয়েছেন তিনি হিন্দুদের ভোটে জিতেছেন, তাই তিনি হিন্দুদের বিধায়ক। তাঁর অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেব ভোটের প্রয়োজন নেই। তিনি আগামী রামনবমিতে ১ কোটি হিন্দুকে রাস্তায় নেমে শোভাযাত্রা করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর জন্য কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। শুভেন্দু বাবু যে ভাষায় কথা বলছেন তা অসাংবিধানিক ও সুস্থ ভদ্র সভ্য সমাজের পরিপন্থী। এর জন্য রাজ্য সরকারের উচিত ছিল এফ.আই.আর. দায়ের করা। সে কাজটি তাঁরা করেননি। উল্টে তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ূন কবির ও শওকত মোল্লা পাল্টা বিভাজন সৃষ্টিকারী বক্তব্য রেখেছেন যাতে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দলটি আরো সুবিধা পায়। বিধান সভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করতে বিরোধী দলের নেতার তীব্র অনিহা। ২০২১ ও ২০২৬ এ এই রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে পরাস্ত হবার পর এখন তাদের লক্ষ্য হচ্ছে তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানো। মানুষের জীবনের তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট ঢাকা দিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানোই তাদের লক্ষ্য। তাঁদের আচরণ উন্মাদ সদৃশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধান বিরোধী দল ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের জাতীয়তা বিরোধী , পাক সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসোভ , আরবান নকশাল বলে আক্রমণ করছেন। অপরদিকে রাজ্যের শাসক দলের এক বর্ষীয়ান নেতা বলছেন ছাত্রদের দমন করতে ওখানে এক সহস্র পুলিশ বা দুই সহস্র ক্যাডার ঢুকিয়ে দিতেপারেন। এদের সম্পর্কেই কবি লিখেছিলেন -

‘ ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে
অন্ধ সেজন মারেআর শুধু মরে।’

এই ধর্মান্ধ শক্তি সম্পর্কে রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত শক্তিরঐক্য একান্তঅপরিহার্য।

সম্পাদক
শান্তনু দত্তচৌধুরী
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

Scanned with OKEN Scanner

গ্রীণ হাউস গ্যাসের নিঃসরণে উজাড় হয়ে যেতে পারে তামাম হিমবাহ

মনিরুল হক

বেশ কিছু বছর ধরে আমাদের অতি পরিচিত হিমালয় সহ প্রায় সমস্ত পর্বতমালা, গ্রীনল্যান্ড সহ উত্তর মেরু এলাকা এবং সমগ্র আন্টার্টিকা মহাদেশের বিশাল বিশাল সব হিমবাহ এবং তুষারাবৃত অঞ্চলের স্থায়ী বরফ অতি দ্রুত গলতে শুরু করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র ১০ শতাংশ অঞ্চল বরফে মোড়া আছে। কিন্তু হিমবাহ এবং তুষারে মোড়া অঞ্চলগুলি যে হারে গলে যাচ্ছে, সেই হার যদি বজায় থাকে তাহলে এই শতাধীর শেষে হিমালয়, হিন্দুকুশ, আল্পস্, আর্কটিক ও আন্টার্টিকার বহু অঞ্চল বরফশূণ্য হয়ে যাবে। একটি সমীক্ষা বলছে এখন থেকে বিগত ৪০০-৭০০ বছরের সময়কালের মধ্যে হিমালয়ের ৪০ শতাংশ বরফ গলে গেছে। সুমেরু অঞ্চলের বরফ গলার হার প্রতি শতাধীতে ১২ শতাংশের বেশি। কুমেরু মহাদেশের গলনের হার একটু কম হলেও সে গলনের ব্যাপ্তি বিশাল কারণ পৃথিবীর মোট বরফ রাজ্যের ৯০ শতাংশই কুমেরু মহাদেশের এলাকায়।

হিমবাহগুলির এই দ্রুত গলনে সারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, সাথে সাথে বাস্তুতন্ত্রেরও ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই মনে করছে জাতিসংঘ। আর সেই কারণেই জাতিসংঘ ২০২৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক হিমবাহ সংরক্ষণ বর্ষ' হিসাবে ঘোষনা করেছে এবং এখন থেকে প্রতি বছর ২১ মার্চ তরিখটিকে সারা পৃথিবী জুড়ে 'হিমবাহ দিবস' হিসাবে উদযাপন করার ডাক দিয়েছে।

আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠের একটি বিস্তীর্ণ অংশ শুভ্র তুষারে ঢেকে থাকে। সূর্যরশ্মি এই তুষারক্ষত্রে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমন্ডলে ফিরে যায়। আর এই প্রক্রিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, হিমবাহগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের প্রয়োজনীর মিষ্টি জলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের সরবরাহকারী। এশিয়ার ২০০ কোটি মানুষের জলের উৎস এই হিমবাহগুলি। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, হোয়াংহো, ইরাবতী, মেকং সহ মোট ১০টি বড় বড় নদী সারাবছর জলপূর্ণ থাকে এই হিমবাহগুলি কল্যাণে। সুতরাং সত্যিই যদি হিমবাহগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবেও গলে যায় তাহলে এইসব নদী-অববাহিকার সভ্যতাগুলি ভয়াবহ রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

হিমবাহের এই গলন প্রক্রিয়ার জন্য যে বিষয়টিকে প্রধানত দায়ী করা হয় তা হল ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার বৃদ্ধি। পরিবেশে তাপমাত্রা যে ক্রমগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তো আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি। আর তাপমাত্রা বেশি বাড়লে বরফ বেশি গলবে সেটাও আমরা বুঝি। বিগত ১০০ বছরে ভূপৃষ্পৃঠের তাপমাত্রা বেড়েছে ১.১ শতাংশ সেলসিয়াস। কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা এখন যে হারে বাড়ছে তা যদি বজায় থাকে তবে এই শতাধীর শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার হতে পারে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শতাংশের হিসাব যাই হোক না কেন, হিমবাহের গলনের ফল হবে অতীব মারাত্মক। গলনের ফলে মিষ্টি জলের সঞ্চয় কমে যাবে তাই পানীয় জলের সঙ্কট বাড়বে। সমুদ্রে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, সমুদ্র বিস্তৃত হবে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়বে, ভূমিক্ষয়-ভূমিধ্বস বাড়বে। ফলে বাসস্থান ও খাদ্যের সঙ্কট দেখা দেবে। জলের অভাবে সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে, স্বভাবিক উদ্ভিদ, বন-জঙ্গল ধ্বংসের মুখে পড়বে। ভূপৃষ্ঠের এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ার ফলে ঘুর্নিঝড়ের প্রকোপ বাড়বে, সমুদ্রস্রোতও চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। আর একটি বিষয় হল পার্বত্য হ্রদ। প্রকৃতিগত কারণেই পার্বত্য এলাকায় হাজার হাজার হিমবাহ হ্রদ আছে। আমরা দেখেছি, হিমবাহের গলনে সেই সব হ্রদে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি জল এসে জমা হয়। তারপর তা একদিন হঠাৎ ফেটে পড়ে গ্রাম-শহর ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন ধারায় পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে মোটামুটি ১৮০০ সাল থেকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে তার প্রধানতম হল গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন। আবার গ্রীনহাউস গ্যাসের উৎপাদনের জন্য দায়ী বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কয়লা, গ্যাস, তেল এইসব জীবাশ্ব জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহার। আর এই শিল্প-উৎপাদনের মূল কারণ হচ্ছে মানুষের চাহিদা। যত দিন যাচ্ছে ততই আমাদের চাহিদা বাড়ছে, আমরা আরাম-আয়েশের নতুন নতুন ফিকির খুঁজছি। সে সব চাহিদা মেটাতেই গড়ে উঠছে নতুন নতুন শিল্প। আবার লগ্নি পুঁজিও বহু ক্ষেত্রে তৈরি করছে কৃত্রিম চাহিদা। আমরা ছুটছি তাদের পিছনে। ফলে পুঁজি আরও স্ফীত হচ্ছে, সে আবার নতুন পন্য উৎপাদন করছে, বাজার তৈরি করছে। আমাদের প্রয়োজন বোধ বাড়ছে, আমরা আবার প্রলুব্ধ হচ্ছি। পুঁজি আবার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান করছে। আর এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটার নাম দেওয়া হয়েছে- উন্নয়ন।

এই যে বললাম 'আমরা'। এই 'আমরা'তে আবার জনগনের সবাই নেই, আছে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ। এই 'আমরা'; সবসময় ছুটছি আরও ভালো ফ্লাট, আরও ভালো শপিং মল, আরও ভালো স্কুল-কলেজ, আরও ভালো হাসপাতালের লক্ষ্যে। ফলে মাঝে মধ্যে কৌশল করে এই 'আমরা'দের ঋণ মঞ্জুর করা হয়, ক্রয়ক্ষমতা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ভোগ্যপণ্য এঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা, যে কোন রাজ্যের, যে কোন দেশের এমনকি সারা বিশ্বের খুব অল্প সংখ্যক মানুষই এই 'আমরা' শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এই তথাকথিত উন্নয়ন যজ্ঞের অনেক বাইরে অবস্থান করছেন। তবে এই উন্নয়নে তাঁদেরও ভূমিকা আছে। উন্নয়নের জন্য সেই বেশিরভাগ মানুষ জমি দেবেন, শ্রম দেবেন,উচ্ছেদ হবেন, জীবন দেবেন, বিলীন হবেন। এটা উন্নয়নের Thumb Rule. এই নিয়মের কোন অন্যথা ভূ-ভারতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

Scanned with OKEN Scanner

আবার অনেকদিন ধরেই 'টেঁকসই উন্নয়নে'; নামে নতুন এক ধারা প্রচলিত হয়েছে। 'টেঁকসই উন্নয়ন'; নীতির প্রধান কথা হল, প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করা যাবে না, সংশ্লিষ্ট এলাকার বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বাদ দিয়ে কোন পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, কোন রকম পলিউশন ঘটানো যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে লগ্নি পুঁজির চাপে 'টেঁকসই উন্নয়ন' এর নিয়ম-নীতি প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তাই নন্দীগ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নন্দীগ্রামের মানুষের কোন লাভ থাকে না, পরিকল্পনায় তাঁদের অংশগ্রহনের সুযোগও থাকে না। একইভাবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বা গোয়ার সমুদ্র উপকূলে বা মধ্যভারতের কোন জঙ্গলের জন্য যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনের কোন ভূমিকা থাকে না। ভূমিকা থাকে কিছু শহুরে মানুষ আর দালাল, ব্যবসায়ী, ফোড়ে, আমলা আর সবার উপরে লগ্নি পুঁজির। আসলে মানুষের চাহিদার আকাঙ্খাকে জিইয়ে রেখে শোষন করার নতুন নামই হল উন্নয়ন। উন্নয়ন আর পুঁজি এখন সমার্থক হয়ে উঠেছে। তাই লগ্নি পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমি নিজেই যদি এই তথাকথিত উন্নয়নের পিছনে ছুটি তাহলে লড়াইটা করবে কে? ঠিক এই জায়গাতেই একটি দামি কথা বলেছেন সোনাম ওয়াঙচুক। দীর্ঘদিন ধরে লাদাখের প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষের অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া ওয়াঙচুক বলেছেন, — "WHEN DEMANDS ARE GOING ON UNBRIDLED JUST TWEAKING THE SUPPLY SIDE WILL NOT HELP". তাই বলা যায়, উষ্ণায়ন ঘটানোর মূল কারিগর লগ্নি পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই দানা বাঁধবে না যদি না আমরা নিজেদের চাহিদার রাশ টানতে পারি, যদি না নিজস্ব চাহিদাবোধের বিরুদ্ধে তাত্বিক লড়াই করতে পারি।

পৃথিবীর উষ্ণায়ন নিয়ে চিন্তিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। তার প্রতিফলনও পড়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায়। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়—"United Nation's Climate Change Conference" সেখানে সম্পাদিত হয় প্যারিস চুক্তি যা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৬ টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কাছে আহ্বান রাখা হয়েছে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচেয় রাখার জন্য আর চেষ্টা করতে বলা হয়েছে যাতে তা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচেয় থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে এই হিসাবটাও দেওয়া হয়েছে যে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখতে গেলে ২০২৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্যাস নির্গমনের হার ধাপে ধাপে ৪৩ হ্রাস করতে হবে। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখা যায় তাহলেও পৃথিবীর ৩৬% বরফ গলে যাবে। আর যদি তা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় তবে ৫০% বরফ বিলীন হয়ে যাবে।

এদিকে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনে 2nd Boy হচ্ছে আমেরিকা। মহামতি ট্রাম্প এবার ক্ষমতা দখলের পর কলমের এক খোঁচায় জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকা এই প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাস প্রকৃতিতে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি উদার, কোন বাধা তিনি মানবেন না। এ ব্যাপারে 1st এবং 3rd Boy হল চিন ও ভারত। এর পরে আছে রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ। এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে এই বাকি দেশগুলি পরিবেশ-বান্ধব হয়ে নিষ্ঠা সহকারে গ্রীণ হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি চালিয়ে যাবে আর রূপকথার গল্পের শেষ লাইনের মতো 'সুখে-শান্তিতে জীবন কাটিয়ে' যেতে পারব। বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণের বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে পরিণাম কি হতে পারে, তা সম্ভবত আমরাও ভাবতে চাইছি না।

পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই ও উগান্ডা দুহিতা জেনেট

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ আমরা যাব আফ্রিকার উগান্ডায়। আলাপ করবো এক আশ্চর্য লড়াকু পরিবেশ কর্মীর সঙ্গে। নাম জেনেট নিয়াকাইরু আবৌলি। জেনেট তাঁর দেশের মানুষের কাছে তো বটেই, গোটা আফ্রিকার মানুষজনের কাছেই এক অনুকরনীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন পরিবেশ রক্ষায় তাঁর দৃষ্টান্তমূলক কর্মপ্রয়াসের জন্য।

জেনেটের কাজকর্মের কথা বিস্তারিত ভাবে জেনে নেবার আগে, তাঁর দেশের বিশেষ করে তাঁদের জেলার সমস্যা নিয়ে দুয়েকটি কথা বলে নিই। সারা পৃথিবী জুড়েই বদলে যাওয়া জলবায়ুর সমস্যা নিয়ে মানুষজন ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন। কখনো বন্যার জলে বানভাসি তো আবার বৃষ্টিহীন প্রবল খরার দাপট। খরা আর ঝরার এই অনিয়মিতির ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একেবারে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দল। আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনার শিকার হয়েছে পশ্চিম উগান্ডায় অবস্থিত জেনেটদের আবাসিক জেলা কাসেসে (Kasese)। বারংবার বন্যায় ভেসে গিয়েছে সাধারণ কৃষকদের ঘর বাড়ি,খেত ফসল। কেন এমন হচ্ছে?

জেনেট তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলেন, জ্বালানির জন্য নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলার ফলেই বাড়ছে বন্যার তাণ্ডব। শুরু হলো জেনেট নিয়াকাইরু আবৌলির লড়াই, বিগড়ে যাওয়া প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে পুনঃস্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার লড়াই। মেঘের ওড়নায় ঢাকা রুয়েঞ্জারি পর্বতের খাড়া ঢাল এসে মিশেছে পশ্চিম উগান্ডার কাসেসে জেলার কুইন এলিজাবেথ ন্যাশনাল পার্কের নাবাল জমিতে। সমস্যা তো শুধু তাঁর একার নয়,কাসেসে জেলার সমস্ত মানুষের। তাই কাজে নাবার আগেই লক্ষ্যটাকে অনেকটাই বড়ো করে নেয় জেনেট। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে রুখা

Scanned with OKEN Scanner

জমিকে আবার আগের মতো সবুজ শ্যামল করে তুলে নিজের গোষ্ঠীর মানুষজনকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সামিল করা। জেনেট আর তাঁর সহযোগীরা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভাবে, হায়! আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। রুয়েঞ্জারি পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত তাঁদের গ্রামের উর্বর মাটিতে সামান্য প্রয়াসেই ফলতো অঢেল শস্য। বৃষ্টি ছিল নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত। কে জানে কী হলো? বিগত দুই দশক সময়কালের মধ্যে এতোদিনের চেনা ছবিটাই বিলকুল বদলে গেল, বাড়লো বৃষ্টিপাতের অনিয়মিতি, অসময়ের বর্ষায় বাড়লো বন্যার দাপট। কুল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়া বন্যার জল ভাসিয়ে নিয়ে গেল বহু কষ্টে গড়ে তোলা জীবনের সমস্ত আয়োজন।

আকাশের দিকে হাত তুলে ধরে ভাগ্যকে সব ক্ষয়ক্ষতির জন্য দোষ দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি জেনেট। বরং মনকে শক্ত করে কঠিন লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে সামনের কঠিন লড়াইয়ের জন্য; চলো,যাই। গাছ লাগাই। পাহাড়ের ঢাল বরাবর নতুন করে বেড়ে ওঠা একদল বট গাছের নবীন ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে একমুখ আত্মতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে জেনেট উত্তর দেয়, আমরাতো কেবলমাত্র গাছ লাগাইনি, আমরা আশা বপন করেছি আমাদের আগামী দিনগুলোর জন্য।

কাসেসে মিউনিসিপ্যালটির পরিবেশ আধিকারিক ও জেনেটের কাজকর্মের প্রতি গুণমুগ্ধ ইভিলিন মুগুমে জানালেন বৃষ্টিপাতের চরিত্র বদলের কথা। ''আমরা আগস্ট মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বৃষ্টির শুরু দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। হয়তো এক আধ দিনের জন্য এদিক ওদিক হতো। আর এখন সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি নামছে। সেই বৃষ্টিও আগের শৃঙ্খলার ধার ধারছে না। দিন কয়েকের প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে নদী, বাড়ছে বন্যা। জেলার যে সব অংশে নদী নেই, সেখানেও বন্যাকে এড়ানো যাচ্ছে না। বন্যা এখন প্রায় প্রতিবছরের সহচর হয়ে উঠেছে। কুলপ্লাবি বন্যার দাপটে বাড়ছে জীবন ও জীবিকার সংকট।''

বিগত এক থেকে দুই দশক সময়ের মধ্যে উগান্ডার এই অঞ্চলের তাপমাত্রা, ঋতু পর্যায়, বৃষ্টির ধরণ ধারণ,খরা আর ঝরার গতিপ্রকৃতি, সবেতেই রদবদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শুখা খরার সময় যত তত বাড়ছে, ততই কমছে ঝরার পরিমাণ ও স্থায়িত্বকাল। এরফলে একসময় কৃষিতে অগ্রণী কাসেসে জেলায় কমছে কৃষি উৎপাদন। অবস্থাটা একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে উগান্ডা সরকার এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের সদস্যরা সমবেত ভাবে নিবিড় বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সরকারের তরফ থেকে কিছু গাছ লাগালেই সমস্যা মিটে যাবে না, এজন্য চাই সক্রিয় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ। আরও একটি বিষয়তাঁদের নজরে ছিল,তা হলো দেশীয় প্রজাতির গাছেদের প্রাধান্য দেওয়া, কেননা এই প্রজাতির গাছেরা একান্তই কাসেসের বাস্তপরিবেশের উপযুক্ত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক বেশি লাভদায়ক।

এমনি এক পটভূমিতে জেনেটের আবির্ভাব। জেনেট নিজেও এই কঠিন সমস্যায় ভূক্তভোগী,তাই তাঁর পক্ষে সরকারি উদ্যোগে সামিল হওয়াটাই খুবস্বাভাবিকব্যাপার ছিল। জেনেটতাঁর এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করলেন । তাঁদের নতুন করে পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা বোঝালেন এবং বাড়ির কাছাকাছি ফাঁকা এলাকায় বট, অশ্বত্থ,পাকুড় জাতীয় ফাইকাস বর্গের গাছ লাগানোর কথা বললেন। এরফলে মিলবে ছায়া,রোধ হবে ভূমিক্ষয়। আর কৃষিজমির আর্দ্রতা ধরে রাখতে ড্রেসিনা গাছ লাগানোর কথা বললেন।

মাটির মেয়ে জেনেট জানে ফাইকাস বর্গের গাছেদের পরম উপযোগিতার বিষয়টি। সুতরাং তিনি এমন গাছ লাগানোর ওপর বিশেষ জোর দিলেন। গ্রামের মানুষজনকে তিনি বোঝালেন যে এই গাছেরা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে, ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটাই জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকায় এই গাছেরা বাড়ি ও জমি দুটোকেই ছায়ায় ঢেকে রাখে। এদের শিকড় মাটির অনেক গভীরে পৌঁছে যায়, মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে গভীর আলিঙ্গনে ,ফলে নদীর ধার, পাহাড়ের ঢালে মাটির ক্ষয়ক্ষতি সামলানোর কাজ করে। বড়ো এলাকায় ছড়িয়ে থাকায় দমকা হাওয়ার সামনে বাধা প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। এরফলে গাছ সংলগ্ন জমির ফসল ঝড়ের হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পায়। রুয়েঞ্জারি পর্বতের ঢালে যে সব মানুষ পোষা ছাগল পাল চড়িয়ে বেড়ায় তাঁরাও তাঁদের পোষ্যদের খাবার পেয়ে যায় এসব গাছের পাতা থেকে। স্থানীয় লুকঞ্জো ভাষায় ফাইকাস বর্গের গাছেদের ডাকা হয় ওমুটোমা নামে। এই গাছেদের সঙ্গে স্থানীয় আবাসিকদের গভীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। ফলে জেনেটের আহ্বান খুব সহজেই স্থানীয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। এই গাছের ডালপালা থেকে জ্বালানি মেলারও সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে উৎসাহের সামান্যতম ঘাটতি দেখা দেয়নি।

অন্যদিকে জমিতে ড্রেসিনা গাছ লাগানো হলে তা জমির আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ড্রেসিনার সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো যে, এই গাছ খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। Dracaena afromontana প্রজাতির গাছ উগান্ডার কাসেসে জেলার মানুষ মুখ্যত জমির সীমানা চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করেন। দ্রুত বেড়ে ওঠা এই গাছ মাটির ভিতরে থাকা জল ধরে রাখতে সক্ষম। এ ছাড়াও এই গাছের ঔষধি গুণ আছে যে কারণে এই গাছ লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ভূমিকন্যা জেনেট গাছেদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন ফলে, তিনি গ্রামের মানুষজনকে বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে নেমে পড়লেন সোৎসাহে। তিনি বাড়ির আশেপাশের জমিতে এই গাছ লাগানোর পরামর্শ দিলেন যাতে করে এদের সুবিধাগুলো পরিপূর্ণভাবে উশুল করতে পারেন তারা। গাছের প্রতি জেনেটের এই ভালোবাসা তাঁর দিদিমার সূত্রে পাওয়া। তিনিই তাঁর নাতনিকে হাতে ধরে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র, গাছপালা, লতাগুল্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পাঠ দান করেছিলেন যাতে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ধারা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও বহমান থাকে। জেনেটের এসব অজানা ছিলোনা কিন্তু এই প্রয়োজনের মুহূর্তে তা আবার নতুন করে চর্চার সুযোগ করে দিল। তাই

Scanned with OKEN Scanner

জেনেট বলেন, 'এসব কখনোই নতুন নয়। আমাদের কাসেসে জেলার বন, জঙ্গল, মাঠ, পাহাড় সব উজাড় হয়ে যাবার আগে, আমাদের পূর্বজরা এদের কাজে লাগিয়েই নিজেদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতেন। আজ সেইসব মূল্যবান সম্পদকে খুইয়ে আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছি। এটা আমাদের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। নিজেদের অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ না করে এই কাজটি আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে চলবে না, বিশ্বাসের পুনর্নির্মাণের কাজে নিরলস হতে হবে। 'এই কর্মসূচির রূপায়ণের মধ্য দিয়েই জেনেট একই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার সাথে সাথে সামাজিক ঐক্যবন্ধনের কাজটাও সমানভাবে করে ফেললেন'।

বাগানে সুগন্ধি ফুল ফুটলে তার সুবাস যেমন ছড়িয়ে পড়ে বহু দূরে জেনেট নিয়াকাইরুর এই হার না মানা অবিচল লড়াইয়ের কথাও কাসাসে জেলার পরিসীমা ছাড়িয়ে আরও দূরের এলাকায়। স্থানীয় উপজাতীয় নেতাদের পাশাপাশি, রাজনৈতিক নেতা সরকারি আমলা ও স্কুলের শিক্ষকরাও আমন্ত্রণ করছেন জেনেটকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শোনার জন্য। এলাকার মায়েরা নিজেরাই এখন উদ্যোগী হয়ে তাঁদের সন্তানদের শেখাচ্ছেন গাছের কথা, পরিবেশের কথা , তাঁরাই হাতে কলমে শেখাচ্ছেন গাছ লাগানোর ও রক্ষণাবেক্ষণের রকমারি কৃৎ কৌশল। গোটা এলাকা জুড়েই এক নতুন লড়াইয়ের আবহ তৈরি হয়েছে। সকলের মুখেই এখন জেনেট নিয়াকাইরু আবৌলির নাম।

''জেনেট আবৌলি আজকের সমাজে একটা শক্ত খুঁটির মতো। তাঁর অনলস প্রচেষ্টায় আজ নতুন করে জেগে উঠেছে কাসাসে জেলার নারী সমাজ। জেনেট ও তাঁর সহযোগীরা প্রমাণ করেছেন যে দেশীয় প্রজাতির গাছেরাই খরা ও বন্যার আগ্রাসন থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।", বলছিলেন মুগুমে। কথা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে ঝরে পড়ছিল সাফল্যের সুর।

এলাকার মানুষ এখন খুব খুশি। আগের মতো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। জীবন এখন খানিকটা সহজ হয়ে উঠেছে তাঁদের কাছে। মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকায় আগে ফসল শুকিয়ে যেত। এখন তাকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। মহিলারা এখন গ্রামের হাটে ড্রেসিনার পাতা বিক্রি করে বাড়তি দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারছেন, খানিকটা স্বস্তি ফিরে এসেছে কাসাসেতে। তাঁরা বুঝতে পারছেন স্বস্তির হাত ধরেই একদিন সমৃদ্ধি ফিরে আসবে, যেমন ছিল অনেক বছর আগে। খুব দামী কথা বলেছেন জেনেট নিয়াকাইরু আবৌলি। তাঁদের এই বৃক্ষায়ন প্রকল্পের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ''আমাদের এই কর্মসূচি কেবলমাত্র গাছ লাগানোর কর্মসূচি নয় ,এ হলো যা আমাদের টিকিয়ে রাখে তাকে রক্ষা করার, আগলে রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা।"

এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তাঁদের কেননা এই প্রকল্প সর্বত্র সমান সফলতা এখনও পায়নি।কোথাও যথাযথ দেখভালের অভাব, কোথাও পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচন না করা, আবার কোথাও অজকুলের দৌরাত্ম্য চারাগলোকে ঠিকঠাক বাড়তে দেয়নি। আগামীদিনে এইসব এলাকায় নজরদারি বাড়াতে হবে।

সমস্যা ছিল, আছে, থাকবে। তার মধ্যেই পথ চলতে হবে জেনেট ও তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধুদের। বদলে যাওয়া জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলোকে প্রতিহত করে নতুনভাবে পৃথিবীকে গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন উগান্ডার কাসেসে জেলার লড়াকু সৈনিক জেনেট নিয়াকাইরু আবৌলি। তাঁর এই প্রয়াসকে আমাদের কুর্ণিশ। তোমরা এখনি থেমোনা।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক)

এলোমেলো কথা

বদরুদ্দিন উমর এবং বিপ্লবী শুচিবায়ুগ্রস্তিতা

শুভ বসু

আমি গত আশির দশকের গোড়ার দিকে বদরুদ্দীন উমরের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই।মসাম্প্রদায়িকতার উপর লেখা। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গে। বিজেপির ভাষায় আমি সেক্যু - মাকু ঘরানার লোক। সেই দিক থেকে আমার সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের জলচলের কোনও সম্ভাবনা নেই।বদরুদ্দীন উমর আমার ছাত্র জীবনে একজন নায়ক ছিলেন। বাংলাদেশে সিরাজুল ইসলামের মতো বড় ঐতিহাসিক রয়েছেন। মুনতাসীর মামুন এক ধরনের ঐতিহাসিক , কিন্তু উমর সাহেবের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমার মনে হতো লেফেব্রের'র ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস পড়ছি। একটি বিরাট পটভূমিকায় লেখা , খাদ্য সংকট , শ্রেনী সংগ্রাম, ধর্মীয় হানাহানি , পাকিস্তান সরকারের আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জনগণের উত্থানের ইতিহাস। আহমদ কামাল সাহেবের বই রয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু সে বই উমর সাহেবের বইয়ের কাছে ঋণী। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় উমর সাহেবের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

উমর সাহেব মাওবাদী রাজনীতি করতেন। তিনি সুখেন্দু দস্তিদারদের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশির দশক অধি রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।কিন্তু তাঁর রাজনীতি ছিল যতটা আওয়ামী লীগ বিরোধী তার থেকে অনেক কম ধর্মীয় দক্ষিণপন্থার বিরোধী। আওয়ামী লীগের রাজনীতির দুটো দিক। একটি হলো সংকীর্ণ পারিবারিক স্বৈরতান্ত্রিক দিক যার বিরোধী আমরা অনেকেই। সেই দিকের ফলশ্রুতি হলো স্বৈরতন্ত্র এবং একটি ধনতান্ত্রিক বিকাশের রাজনীতি।আর একটি দিক হলো ১৯৫২ সালের পর থেকে ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমাজে যে গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে এবং মানুষের সংস্কৃতির আকুতি প্রকাশের রাজনীতি রয়েছে সেই

Scanned with OKEN Scanner

রাজনীতির দিক। সেই আকুতির দিক থেকে আওয়ামী লীগ হলো বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সংকীর্ণ আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতি যেমন বর্জনের দরকার সেরকমই দরকার তাঁদের ভাষা কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা কে বাঁচিয়ে রাখা।

বদরুদ্দীন উমর সাহেব ভাষা আন্দোলনের বিরাট পটভূমি দেখেছেন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে দেখেছেন বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম। প্রকৃত পক্ষে তাঁর বাবা আবুল হাসিম সাহেবের হাত ধরেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের উত্থান। কিন্তু আবুল হাসিম সাহেব এর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বর ফলে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ এবং তার ফলে শেখ মুজিবের সঙ্গে আবুল হাসিম সাহেবের যে বিবাদ তার ছায়া যেন বদরুদ্দীন উমরের লেখাতে পড়েছে। ফলে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৎকালীন নব গঠিত দল আওয়ামী মুসলিম লীগের যে ভূমিকা ছিল সেটা স্বীকার করতে তাঁর কৃপণতা রয়েছে।

আবার বদরুদ্দীন উমর আর তাঁর লেখায় মনি সিংহের কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। মনি সিংহ বাংলাদেশের দুর্গাপুর সুসং অঞ্চলে সাধারণ কৃষকদের নিয়ে সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে একটি বিপুল আন্দোলন তৈরী করেন। তিরিশের দশক থেকে বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মনি সিংহের ভূমিকা বিপুল। উমর সাহেব সেই তুলনায় একান্ত ভাবে বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী। একজন কৃষক আন্দোলন না করা মানুষের কৃষক আন্দোলনের যুক্ত থাকা মানুষের সমালোচনা করা বেমানান লাগে।

মৌলানা ভাসানী বাংলাদেশে ইসলামিক সমাজতন্ত্রর তত্ত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা নিয়ে বাম ঘরানার সব থেকে জনপ্রিয় মানুষ। তাঁর নানা বৈপরীত্য ছিল টানা পড়েন ছিল, পরস্পর বিরোধিতা ছিল, কিন্তু তিনি ষাটের দশকের বৈপ্লবিক আন্দোলনের এক পরিচিত মুখ। মৌলানা ভাসানীর থেকে বাম আন্দোলনকে দূরে সরিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উমর সাহেব পালন করেছিলেন। তার কারণ সেই বৌদ্ধিক পরিশুদ্ধতা। বিপ্লবী আন্দোলন কোনো পরিশুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। তার মধ্যে বহু ধরণের মানুষ থাকেন। লিবারেশন থিওলজি র মানুষেরা লাটিন আমেরিকার বাম আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উমর সাহেব কিন্তু সে দিক থেকে বিল্পবী শুচিবায়ুগ্রস্ততায় ভোগেন।

ষাটের দশক ছিল বিপ্লবীদের দশক। সেই দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, কিউবার ট্রাই কন্টিনেন্টাল আন্দোলন চে গুয়েভারার মৃত্যু, ভিয়েতনামের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারা , আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশ গুলির মুক্তি আন্দোলন এবং পঞ্চাশের দশকে ফানোর বিপ্লবী তত্ত্ব , Walter রোডনির নির্ভরশীলতার তত্ত্ব , আন্দ্রে গুন্ডের ফ্রাঙ্কের তত্ব এবং তার আগেই আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম এবং পরে প্যালেষ্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম তার ছায়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরে। সেই সময় ফ্রান্স এ আলথুসারের উত্থান এবং সিচুয়েশনিস্ট ইন্টান্যাশনাল এর তত্ত্ব বা বা ফানোর লেখার উপরে জা পল সাঁত্রের উপক্রমণিকা এবং রেজিস দেবরের বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব এই সবের ফসল হলো পাকিস্তানে ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথ্যান। সেই সময় বদরুদ্দীন উমর এবং নকশাল পন্থীরা তাঁদের পার্টির মধ্যে ভাঙ্গনের রাজনীতি, ন্যাপের মধ্যে ভাঙ্গনের রাজনীতি করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতিকে দুর্বল করে ফেলেন। ফলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে তাঁরা কোনঠাসা হয়ে যান। এর কারণে পার্টির বিভক্তি। একবারে বিধ্বংসী বিভক্তি। একজন বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁদের এর পরিণতি বোঝার প্রয়াস করা উচিত ছিল। আমার সিপিআই(এম) নিয়ে গর্ব এই কারণে তাঁরা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তির সময়ে প্রাথমিক ভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ নিলেও পরে চীন এবং সোভিয়েতের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান নিতে পেরেছিলেন।

ফলে বদরুউদ্দিন উমরের জন্মদিনে আমার লাল সেলাম রইলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার নিজের সমালোচনা রইলো। আজকের বাংলাদেশে রাজনীতি কোনো দিকে যাবে তা জানি না। তার একদিকে রয়েছে বিপ্লবী পুনর্গঠনের গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা আর অন্য দিকে রয়েছে তথাকথিত তৌহিদী জনগণের নর্তন কুর্দন আস্ফালন। তাঁর মধ্যে বাম গঠনতান্ত্রিক এবং শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের প্রয়াস এর প্রয়োজন রয়েছে। আমি ব্যক্তি মানুষের আরাধনার বিশ্বাস করি না। বদরুদ্দীন উমর সেই ধারার মানুষ। তাই তাঁর জন্মদিনে একটি বিপ্লবী আত্ম-সমালোচনা করলাম।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

এই তো আমার চেনা না-চেনা বাংলাদেশ

মিলন দত্ত

'একুশে'র উদযাপন দেখতে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। 'নতুন' এবং 'স্বাধীন' বাংলাদেশে। এর আগেও বার দুয়েক গেছি। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ তারিখ রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে যায় মিছিল করে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেওয়া। যে যার সাধ্য মতো ফুলের বিশাল বিশাল বোকে থেকে শুরু করে নিজের বাগানের একটা গোলাপ পর্যন্ত রেখে যান শহিদ মিনারে। হাজারে হাজারে মানুষ নিজ নিজ সংগঠন, সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টেল, ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্যনার নিয়ে মিছিল করে যেতে থাকেন শহিদ মিনারের দিয়ে। মিছিলের মুখে মুখে থাকে একুশের গান। গোটা ঢাকা শহরের সেদিন অন্য এক রূপ। শহিদ মিনারের একেবারে পাদদেশ থেকে গোটা চত্বর ঢেকে যায় নানা রঙের ফুলে। বিশাল চত্বর জুড়ে কেবলই ফুল। স্বেচ্ছাসেবীরা হিমসিম খেতে থাকেন নতুন-আসা ফুলের জায়গা করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

Scanned with OKEN Scanner

সামান্যই ফুল এবার শহিদ মিনারে। মিছিলের সংখ্যা নেহাতই কম। গলায় নেই গান। যে চত্বরে ফুলের ভারে হাঁটার জায়গা থাকত না সেখানে নানা কিসিমের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজনে ভর্তি। গান আছে কেবল মাইকে। একুশের ভোর পাঁচটা থেকে ঘণ্টা দুয়েক শহিদ মিনারে অবস্থান করে এবার আমার এই অভিজ্ঞতা। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। সেগুলো পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'নতুন' এবং 'স্বাধীন' বাংলাদেশে ভয়ানক অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে সাধারণ মানুষ। আমারা দুই দেশের সংবাদ মাধ্যম আর সমাজমাধ্যমে যে ভারত বিদ্বেষ এবং বাংলাদেশ বিদ্বেষ দেখি, ঢাকা বা ঢাকার বাইরে অনেক ঘুরেও তার তেমন আঁচ পাইনি। অন্তত আমি ভারতীয় হিসেবে কোনও রকম বিদ্বেষ বা গঞ্জনার মুখে পড়িনি। যে কোনও দেশেই সমাজের থাকে অনেকগুলো স্তর; খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষকে তার রুজি রুটির ধান্ধায় এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় যে উপরি স্তরের এইসব প্রচার হয়তো তাদের তেমন করে স্পর্শ করে না। কিংবা ওই সব প্রচারের পেছনে ধাওয়া করার মতো বাড়তি সময় তাদের নেই। তবে সে দেশের সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, রাস্তাঘাটে নিরাপত্তার অভাব, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির বাড়বাড়ন্ত, দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন; ভীষণভাবেই উদ্বিগ্ন। দেশের প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষের আশু চাহিদা একটা নির্বাচিত সরকার। ব্যাস, আপাতত এইটুকুই। কারণ হাসিনা সরকারকে উতখাৎ করে তথাকথিত ব্যষম্য বিরোধী ছাত্র-জানতা সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ সব দিক থেকেই দ্রুত তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। শিল্প-উৎপাদন, বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, লেখাপড়া; সব দিক থেকে।

কিন্তু নির্বাচন হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি। ঢাকার প্রথম শ্রেনির বাংলা দৈনিকের সম্পাদকও সাধারণ মানুষের মতোই নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চিত। কিন্তু সরকারের অংশীদার সমন্বয়ক, উপদেষ্টা (মন্ত্রীর সমতুল্য) এবং জামায়াত ইসলাম ও তার দোসর ইসলামি দলগুলো ছাড়া দেশের প্রায় সব মানুষই বুঝতে পারছেন, একটা নির্বাচিত সরকার ছাড়া দেশের মানুষের মনে আস্থা ফেরানো সম্ভব নয়; দেশের হাল ফেরানো সম্ভব নয়। গত পনেরো বছরে শেখ হাসিনা চালিয়েছেন স্বৈরাচারী শাসন, নির্বাচনকে হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যান এবং গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে তার স্বাসরুদ্ধ করে দেন। যাবতীয় দোষ মেনে নেওয়ার পরেও বাংলাদেশের মানুষ জানে এবং মানে যে ওই স্বৈরশাসক বাংলাদেশকে উন্নতির এক নজিরহীন শিখরে উন্নীত করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে, হাসিনার আমলে বাংলাদেশে এমন এক অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে যা অলৌকিকের চেয়ে কম কিছু নয়। বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে, ভারতের সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান কৌশলগত মিত্রতা এবং চীন ও আরব বিশ্ব উভয়ের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করেছিল। যে দেশকে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার একসময় 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র তকমা দিয়েছিলেন, গত ১৫ বছরে সেই দেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করেন শেখ হাসিনা।

আর আজ বাংলাদেশের কি আবস্থা? গত সাত মাসে ৪৪টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। ফলে রফতানি কমেছে। গ্যাস সরবরাহজনিত সমস্যা, ব্যাংক থেকে সহায়তার অভাব ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে তারপর আরও ৩২টি কারখানার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে ৩১ হাজার ৪০০ শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে উৎপাদনখাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৪ শতাংশ। যা আগের বছরে একই সময়ের ১০ শতাংশ থেকে অনেক কম।

আইন শৃঙ্খলার অবস্থা আগেও খানিকটা বলা হয়েছে। কিন্তু এমনটা হল কেন? সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকার পতনের পর প্রতিশোধমূলক হিংসা ও নিপীড়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক, পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। এছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়, আহমদিয়া মুসলিম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তাদের বাড়ি ও মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দেদার ভাঙা বয়েছে এবং হচ্ছে সুফিদের প্রাচীন মাজার আর দরগা। এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার প্রায় কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। উলটে, বৈষম্য দূর করার চেতনা নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার আদিবাসী স্বীকৃতিকে মুছে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে। তারা আদিবাসী শধটাই ব্যবহার কতে চায় না, বাংলাদেশে নাকি বাঙালিরাই একমাত্র আদিবাসী, বাকি সব উপজাতি।

বাংলাদেশে মোট ৬৬৪টি থানা আছে। ৫ আগস্ট ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি, বক্সসহ পুলিশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়ি। পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ লুট হয়। কার্যত ৫ আগস্ট দুপুরের পর সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পুলিশ থানায় যেতে সাহস পাননি। কেবল এনায়েতপুর থানাতেই ঘর বন্ধ করে পুড়িয়ে মারা হয় মৃত্যু ১৫ জন পুলিশকর্মীকে। তাঁদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা সাব ইন্সপেক্টরও ছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে, ১৩ আগস্ট থেকে ঢাকাসহ সারা দেশে থানাগুলো আবার সক্রিয় হতে শুরু করে। কিন্তু এখনও বহু পুলিশ আতঙ্কে পলাতক। যাঁরা কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁরাও পুরোপুরি সক্রিয় নন। পুলিশ কার্যত সেনাবাহিনীর নেজুর হয়ে কাজ করছে। লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছে দুষ্কৃতিদের হাতে। বাংলাদেশে এখন 'মব'-এর মুলুক। এখন আর বাংলাদেশে কেউ মগের মুলুক বলে না।

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে ২ হাজার ২০০ আসামি পালায়। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এখনো ৭০০ আসামি

Scanned with OKEN Scanner

পলাতক। তাঁদের মধ্যে ইসলামি জঙ্গি, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত, ভয়ানক সন্ত্রাসীর মতো ৭০ জন আসামি রয়েছেন। এ ছাড়া কারাগার থেকে এখন পর্যন্ত ১৭৪ আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী যেমন রয়েছে, তেমনই বহু খুনিও আছে। এর মধ্যে ১১ জন ভয়ানক সন্ত্রাসীও মুক্তি পেয়েছে। পুলিশের লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ রয়েছে অপরাধীদের হাতে। এগুলো সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করা না গেলে, জেল পলাতক আসামিদের ধরতে না পারলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করা সম্ভব নয়।

গত ৪ মার্চের 'প্রথম আলো'য় লেখা হয়, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সাত মাসে দেশে গণপিটুনির অন্তত ১১৪টি ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১৯ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হয়েছেন। আর গত ১০ বছরে গণপিটুনিতে মারা গেছেন কমপক্ষে ৭৯২ জন। আহত হয়েছেন ৭৬৫ জন। আজ বুধবার মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এসব তথ্য জানিয়েছে।' ঢাকা থেকে প্রকাশিত ওই প্রথম শ্রেনির দৈনিকে আরও জানতে পারি, 'দেশে গণপিটুনির ঘটনা আগে ঘটলেও ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পালাবদলের পর এ ধরনের ঘটনা নতুন মাত্রা পায়। আগে চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা বেশি ঘটলেও এ সময় দলবদ্ধভাবে হামলার ঘটনা বেড়েছে, যা ইতিমধ্যে 'মব' নামে পরিচিতি পেয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপর এ ধরনের ঘটনাকে মানুষের রাগ-ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখেন অনেকে। তবে ছয় মাস পর এসেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ওঅধিকারকর্মীরা এ জন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন।'

বইমেলায় গিয়ে দেখেছি ক্রেতা প্রায় নেই। একুশের আগেই আমি বইমেলায় গিয়েছিলাম; ১৯ ফেব্রুয়ারি। অবস্থাটা একই রকম। মেলায় মানুষ আছে; তারা অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে, মূলত সেজেগুজে সেল্ফি নিয়ে ব্যস্ত। বইয়ের স্টলে হাজিরা সামান্যই, ফলে বইয়ের বিক্রি নেই। এই বিষয়টাকে বড় ধরণের অসুখের উপসর্গ হিসেবে দেখছেন অনেকে। বইমেলায় কম বিক্রি হওয়ার ঘটনা সেই সাধারণ জ্বর যা বিরাট একটি রাষ্ট্রীয় সমাজিক অসুস্থতা বলে দেখতে চান বাংলাদেশের মানুষের একাংশ। তথাকথিত ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পর তথাকথিত ছাত্র-জনতার সরকারের আমলে বইমেলায় বই বিক্রি হয়েছে ৬১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৯৩ টাকার। ২০২৪ সালের বইমেলায় বিক্রি হয়েছিল ৬০ কোটি টাকার। ২০২৩ সালে বিক্রি হয়েছিল ৪৭ কোটি। ২০২১ সালে করোনো জনিত লকডাউনের সময়ও বিক্রি হয়েছিল ৩ কোটি টাকার। ২০২০ সালে সম্ভবত রেকর্ড ৮২ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। প্রকাশকরা স্বভাবতই অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। কারও কারও মতে, ওহাবী ইসলামপন্থীদের মাজার ও শিল্পকলার উপর আক্রমণ এখনও চলছে কারণ সরকারের সমর্থক হিসেবে তাদের আধিপত্য আজ ব্যপক। এই পরিস্থিতিতে দেশের পুস্তকপ্রেমি, সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী, চিন্তক, লেখক, এবং তন্ময় পাঠক নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত। বই কেনার সেই মনের সুস্থিতা তার নেই।

গত অগস্টে শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও পুরোপুরি কাটেনি। তারপর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিরা পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অসহযোগিতার অভিযোগ এনে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাদের বহিস্কারের দাবি তোলা হয়। ওই দাবির মুখে কোথাও কোথাও তারা পদ ছেড়েছেন, দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা ঘটেছে তা সব ধরনের ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। কোথাও শিক্ষার্থীরা আবার কোথাও বহিরাগতরা শিক্ষকদের শুধু জোর করে পদত্যাগই করায়নি, জুতার মালাও গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মারধর করা হয়েছে। কোথাও কোথাও শিক্ষকরা অপমান ও মানসিক পীড়ন সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই সব ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে ভয়ানক অপমানের মধ্যে ফেলেছে। এসব ঘটনা ঘটতে থাকলেও প্রথম দিকে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচারিতা আটকানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি।

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে তখন আইয়ুব খানের শাসন, হুমায়ূন আহমেদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সময়ের একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'মাতাল হওয়া' উপন্যাসের এক জায়গায় লেখেন, 'দেশ এখন চলে গেছে ছাত্রদের হাতে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশ চালাচ্ছে। তারা যা নির্দেশ দিচ্ছে সেইভাবে কাজ হচ্ছে। দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা কোনোটাই তাদের নেই। তারা ভুল করা শুরু করবে। তখন বড় সমস্যা তৈরি হবে। এক ভুল থেকে আরেক ভুল। ভুলের চেইন রিঅ্যাকশান।' উপন্যাসের এই অংশটুকুর সঙ্গে অদ্ভুত মিল আজকের বাংলাদেশের। এমন একটা মিল পাওয়ার কারণেই উপন্যাসের অংশটুকু উদ্ধৃত করলাম মাত্র। এখন সত্যিই কিন্তু বাংলাদেশ চালাচ্ছে তথাকথিত ছাত্ররাই। তথাকথিত বললাম এই কারণে যে যারা দেশ চালাচ্ছে উপদেষ্টা হয়ে কিংবা ক্ষমতাশীল ওই ছাত্রদের নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি'র নেতাদের কেইউ প্রায় আর ছাত্র নন। তাঁরা ছাত্র ছিলেন পাঁচ থেকে দশ বছর আগে। কিন্তু ক্যাম্পাস ছাড়েননি নানা অছিলায়। ছাত্র-জনতার নতুন যে পার্টি তৈরি হল বাংলাদেশে তাকে বনা হচ্ছে কিংস পার্টি অর্থাৎ শাসকের দল। ক্ষমতায় থেকে যখন কোনও রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় তখন সেটা হয় কিংস পার্টি। এর আগেও বাংলাদেশে সামরিক শাসক এরশাদের সময় 'জাতীয় পার্টি' এবং জিয়াউর রহমানের আমলে 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি' কিংস পার্টি হিসেবেই জন্ম

Scanned with OKEN Scanner

নিয়েছিল। নতুন পার্টি গঠিত হলেও ঠিক কবে তাঁরা দেশে ভোট করতে চাইবেন সেটা আপাতত লাখ টাকার প্রশ্ন হয়েই ঝুলে রয়েছে।

তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনীতি গতিপ্রকৃতি নিয়ে নানা রকমের অনুমান জারি আছে। মূলত চার রকমের মত পাওয়া গেছে

১. এই রকম নৈরাজ্য চলতে থাকলে এবং দ্রুত নির্বাচন ঘোষণা না করলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে নেবে। বাংলাদেশ আরও একবার সেনা শাসনে চলে যাবে। সে দেশের মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলাইবাহুল্য প্রথম মতটি সবচেয়ে প্রবল।

২. নবগঠিত 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' জামায়াত ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ভোটে লড়বে। নতুন সরকারের ওপর মানুষের আস্থা যে গতিতে কমছে এবং নির্বাচনে জামাতের যা ট্র্যাক রেকর্ড, তাতে ওই জোটের পক্ষে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া নতুন দলের একাংশ চাইছে না একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তানের দোসর জামাতকে সঙ্গে নিতে। তাতে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

৩. জামায়াত ইসলামি অন্যান্য ইসলামি দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ভোটে লড়বে। তাতেও জেতার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তবে জামাত রোজার মাসে দেশ জুড়ে অত্যন্ত সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য বিক্রির দোকান খুলে গরিব মানুষের কাছে তার ভবমূর্তি ফেরাতে চাইছে। তাতে কাজ হবে কিনা সাধারণ মানুষ নিশ্চিত নয়।

৪. সর্বশেষ সম্ভবনাটা হল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বা বিএনপি। অনেকে মনে করছেন একমাত্র বিএনপি ক্ষমতায় এলেই দেশটা খানিকটা হলেও বাঁচবে। যদিও দেশে তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেটেগুলো থেকে আওয়ামী লীগের মস্তানদের ছেড়ে যাওয়া সাম্রাজ্য দখল করেছে বিএনপি। সেটা নিয়ে অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের মতোই বাংলাদেশেও ভোটে দুর্নীতি কোনও বিষয় নয়। আওয়ামী লীগের অনেকে পুরনো ভোটারের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, নির্বাচন হলে তাঁরা বিএনপি-কে ভোট দেবেন। তাছাড়া একমাত্র বিএনপি-ই চায় না আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হোক। বরং তাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে বিএনপি।

উপরের এই অনুমান ও সম্ভাবনার কথা কোনওটাই আমার নয়। বাংলাদেশের নানা স্তারের মানুষ আর বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে যে ধারণ তৈরি হয়েছে সেটাই জানালাম।

শেষে বলি, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের যে খবর এ দেশের সংবাদ মাধ্যমে পাই তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সে দেশে সংখ্যালঘুরা কোনও দিন ভাল ছিল না। ১৯৪৭-এর ২১.৪৫ শতাংশ হিন্দু এখন সাত শতাংশে এসে ঠেকেছে। দেশের নতুন সরকার তাদের নিরাপত্তা দেবে না। কেবল হিন্দু নয়, সব রকমের ধর্মীয়, জাতিগত এবং ভাষিক সংখ্যালঘু রয়েছে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুরা যে চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; সেই তুলনায় শহরের বিশেষত ঢাকার হিন্দুরা ভাল আছে। বইমেলায় গিয়ে দেখলাম কাছেই রমনার কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে কয়েকজন শাড়ী পরা সুসজ্জিত তরুণী কাছেই লেকে গেছেন ফুলের ডালি হাতে পুজো পরবর্তী কোনও কৃত্যের জন্য। তারা উলু দিচ্ছে শাঁখ বাজাচ্ছে, বিকেলের বইমেলার ভিড় তাদের দেখছেও না। আবার একুশের প্রায়ান্ধকার ভোরবেলা ধানমণ্ডির পথ ধরে হাঁটছিলাম শহিদ মিনার যাওয়ার একটা রিক্সা ধরার জন্য। দেখি লাল পেড়ে হলুদ শাড়ী পরা কয়েকজন বধূ নানা উপাচারে ভরা ডালি হাতে চলেছেন লেকের দিকে। তাঁদের সঙ্গে ছোট একটা ব্যান্ড পার্টি। রীতিমতো সমারোহে তাঁরা চলেছেন বিয়ের লোকাচার সম্পন্ন করতে; জল সইতে। এই তো বাংলাদেশ। (৭ মার্চ২০২৫)

শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ

ঋত্বিক ঘটক
এক অনন্য প্রতিভা

সফদার হাসমি

২

১৯৫২ সালে তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নাগরিকে'র শুটিং করার সময়, ঋত্বিকের সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই সীমিত, সম্বল বলতে নামমাত্র টাকাকড়ি এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে অব্যবহৃত একঝাঁক কলাকুশলী। তাঁর উত্তরাধিকার এমন একটি শিল্পমাধ্যম যা ভারতে তখনও তেমনভাবে ডালপালা মেলে গড়ে ওঠেনি। তবুও, বলা যায় তাঁর বিষয়বস্তুর জটিল প্রকৃতি যথাযথভাবে তুলে ধরার তাগিদেই ঋত্বিক তাঁর শিল্পপ্রণালীতে আত্মস্থ করেছিলেন সারা বিশ্বে এই মাধ্যমের সঞ্চিত ও প্রযুক্ত জ্ঞানকে। তার ফলশ্রুতিতে, এমন একটি ছবি তৈরি হয়েছিল, যা শুধু কাহিনির সাপেক্ষেই নয়, বরং মাধ্যমের প্রযুক্তিগত এবং ব্যাকরণগত কাঠামোর সাপেক্ষেও একইরকম এগিয়ে ছিল। তাঁর প্রতিভার এক অন্যতম অনুষঙ্গ হল তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। এহেন ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্রকে এক দ্বান্দ্বিক কাঠামোতে গড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজে লাগিয়েছিলেন শব্দকে। চিত্রমাধ্যমে শব্দের ব্যবহারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর হাতে প্রথমবারের জন্য, ভারতীয় চলচ্চিত্রে শব্দ কেবল সংলাপ এবং ঘটনার 'প্রভাব' কে বাড়িয়ে তোলার সুর হয়ে থাকে না; বরং সম্পূর্ণ বিন্যাসের একটি সচেতন অংশ হয়ে ওঠে। তার উপযোগিতা হয় গভীরতর। তাঁর ছবিতে শব্দ তাৎক্ষণিক সংলাপধর্মী এবং আখ্যানধর্মী প্রেক্ষাপটকে প্রশ্ন করে, বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনাকে একটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ প্রদান করতেও সক্ষম হয়।

ঘটকের আরেক অভিনবত্ব হল 'ডিপ ফোকাস' ব্যবহার করে চরিত্রগুলিকে তাদের সামাজিক পরিবেশে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার কৌশল রপ্ত করা। এই পদ্ধতিটি তিনি 'নাগরিকে' প্রথমবার ব্যবহার

Scanned with OKEN Scanner

করেছিলেন এবং এটি পরবর্তীতে তাঁর শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ছবিতে কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে প্রথমবারের মতো দেখতে পাই আমরা শহর কলকাতার এক বিস্তৃত প্যানোরামিক দৃশ্যের পর। ক্যামেরা প্যান করে দেখাতে থাকে সার দেওয়া ঝুপড়ি ও দোকান, আকাশছোঁয়া বাড়ি ও বস্তি, শহর জুড়ে বৈদ্যুতিক তারের কাটাকুটি, এবং দৈনন্দিন কাজে বেরনো সাধারণ মানুষের ভিড়ে ভরা রাস্তাঘাট। এরপর কমপক্ষে বিশ ফুট উচ্চতা থেকে তোলা একটি লং শটে তিনি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সে ভিড়েরই একজন, তাকে এক বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে দেখি আমরা। পর্দার এই সাধারণ নাগরিক-নায়ক হেঁটে চলে সংকীর্ণ নোংরা গলি দিয়ে, ভিখারী ও পথশিল্পীদের পাশ দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে থাকে ক্যামেরা। এত কিছুর পরে যখন ক্যামেরা নায়কের মুখের উপর এসে স্থির হয়, ততক্ষণে দর্শকরা তাকে নিজেদেরই একজন হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, পর্দার নায়ক তাঁদেরই মতন, কোনওভাবেই সে অসাধারণ, বীরত্বপূর্ণ, ধনী, বা সুদর্শন কিছুই নয়, অথবা অলীক কল্পনার জগতে কোনও রোমহর্ষক অভিযানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে আসেনি। ঋত্বিকের সমস্ত চরিত্র তথা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি আসলে এক জনপ্রিয় এবং অধঃপতিত চলচ্চিত্ররীতিকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। সেই রীতির বৈশিষ্ট্যই হল, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তির জীবন, তিনি ভাগ্যবিপর্যয় অথবা কোনও অদ্ভুত দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির শিকার হবেন এবং তারপর নিবিড় মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে দেখা হবে সেই পরিস্থিতিকে। আবার এই খুঁটিয়ে দেখার অধিকারী একমাত্র তারাই, যারা যে কোনও উপায়ে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে আরও উঁচুতে বা দূরে সরে এসেছেন।

একটি প্রবেশক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঋত্বিক ঘটকের সমগ্র কর্মজীবনের আলোচনা সম্ভব হবে না। তাই আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, এই প্রতিভাবান মানুষটি তাঁর ছবির মাধ্যমে গণ-চলচ্চিত্রে ও চলচ্চিত্রের ভাষায় কী অপরিসীম অবদান রেখেছেন, তাই নিয়ে।

ঋত্বিক ঘটক যখন কাজ শুরু করেন, তখন ভারতীয় চলচ্চিত্র বিকাশের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। যদিও ততদিনে সামাজিক নানান ক্ষেত্রের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে কিছু জোরালো ছবি তৈরি হয়েছিল, তবুও চলচ্চিত্র বলতে মূলতঃ বোঝাত একটি বা দুটি ক্যামেরা স্থির রেখে একটি সোজাসাপটা গল্প রেকর্ড করা, অনেকটা যেন উজ্জ্বল আলোকিত মঞ্চে কোনও নাটক অভিনয়ের মত। একটি দৃশ্যের বিশ্লেষণে বা ব্যাখ্যায় ক্যামেরার অবস্থান, সম্পাদনার ধরণ, দৃশ্য সংমিশ্রণ, প্রতীকের ব্যবহার, দৃশ্য বিন্যাস ইত্যাদি নানান কৌশল কীভাবে অগণিত সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, তৎকালীন চলচ্চিত্র নির্মাতারা এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবেননি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তখনও একটি স্বতন্ত্র সিনেমা ভাষাই গড়ে ওঠেনি। ঋত্বিকই প্রথমবার দেখিয়েছিলেন যে সিনেমার ক্যামেরা কেবল এক বাধাহীন আড়ি পাতার যন্ত্র নয় বরং সে হতে পারে একাধারে একজন ভাষ্যকার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক এবং কবি। তার সার্থকতা একদল চরিত্রের জীবনের জানালা হয়ে নয় বরং মানুষের বেঁচে থাকার একজন সাক্ষী হয়ে। কীসের সাক্ষ্য? গল্প বলা, স্মৃতি, প্রত্যাখ্যান, গ্রহণ, প্রশ্ন, প্রতিবাদ, পরাজয় ও জয়ের। এইভাবে ঋত্বিক ভারতীয় সিনেমাকে দিলেন এক স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যমের ধারণা এবং শেখালেন এই নতুন ভাষাটির সচেতন ব্যবহার। 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) থেকে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) হয়ে 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২) পর্যন্ত ঋত্বিক তার গল্পের দাবি অনুসারে তাঁর শিল্পের প্রকাশভঙ্গি বারংবার নতুন কাঠামোয় গড়েপিটে নিয়েছেন। এভাবেই তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল। 'সুবর্ণরেখা'-য় আমরা দেখতে পাই, চলচ্চিত্রটি একই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে এগিয়ে চলেছে; সেখানে সংলাপ, সঙ্গীত এবং দৃশ্য কেবলমাত্র 'গল্প'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাহন হয়ে থাকে না। এই প্রতিটি উপকরণের রয়েছে এক নিজস্ব জীবন, সবগুলির সংমিশ্রণ থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি উপকরণই নিজস্ব গতিতে, নিজের পথে এগিয়ে যায় যেমন, তেমনই চলচ্চিত্রের সামগ্রিকতায় তাদের প্রভাব পড়ে, এবং একইসঙ্গে সেই সামগ্রিকতা থেকেই আবার জন্ম নেয় উপকরণগুলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংলাপ এবং সঙ্গীত মাঝে মাঝে ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী ধারা অনুসরণ করে এগোয়, দুটিই নিজেদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে চলে, এবং উভয়ের সংঘর্ষের মাধ্যমে জন্ম নেয় তৃতীয় এক গভীরতর অর্থ। তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নেন, বাস্তব জীবনের কিছু অতি সাধারণ পরিস্থিতিদের, যেগুলিতে এমনকি চরম আবেগঘন মেলোড্রামার উপাদানও রয়েছে, কিন্তু সেগুলিকে এমনভাবে ঐতিহাসিক ভিত্তি দিয়ে পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন, যে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় সহানুভূতি অথবা বিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির ফুটিয়ে তোলা রসে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আমাদের শ্রেণিজর্জর সমাজের বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হিসেবে পাওয়া যন্ত্রণা, কষ্ট, নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ছবির নায়করা সারা জীবন জুড়ে চরম আঘাত এবং যন্ত্রণাদায়ক বিবিধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সেসব দেখিয়ে কাহিনীর শেষের দিকে তিনি বলেন, জীবন থেমে থাকে না। 'সুবর্ণরেখা'-তে ভবিষ্যতের ভাবনার সারমর্মটি কেন্দ্রীভূত রয়েছে একটি দৃশ্যে; একটি শিশু আমাদের নায়ককে, ট্র্যাজিক হিরোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে, দুঃখের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার এক বিমূর্ত প্রতিশ্রুতি ধারণ করে। 'মানুষ বিজয়ী হবেই' এই বার্তাটি একেবারে অমোঘভাবে, কিন্তু বড় কোমল ও কাব্যিক ভঙ্গিতে পৌঁছে যায় দর্শকমনে। তাঁর তুলনায় মধ্যমানের সমসাময়িকরা থিয়েটার ও সিনেমায় স্লোগানের ভঙ্গিতে এই একই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু দুটির প্রকাশভঙ্গি ও আবেদনে কী আশ্চর্য ফারাক!

Scanned with OKEN Scanner

তাঁর আটটি ছবির মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটিতে, জীবনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বাহন' হয়ে ওঠে একটি শিশুর পুনরাগমন। অন্য তিনটিতে একই ভাবনা অন্যান্য প্রতীকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে;'কোমল গান্ধারে' বিবাহের মাধ্যমে, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-তে পলাতক শিশুটির বাড়ি ফিরে আসার মাধ্যমে, 'নাগরিকে' দরিদ্র হয়ে যাওয়া পরিবারটি তাদের মধ্যবিত্ত পাড়া ও মূল্যবোধ ছেড়ে শ্রমিকদের এলাকায় বসবাস করতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে।

ঋত্বিক ঘটক যে শিল্পমাধ্যমে কাজ করেছিলেন, সেটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রসার ঘটায়, বিশেষ করে এমন এক পরিসরে, যেখানে প্রগতিশীল চলচ্চিত্র আন্দোলন বলে কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পীর ভূমিকার বিশ্লেষণ করার অভ্যাস হারাননি। তিনি কখনও কোনও দ্রষ্টা বা পয়গম্বরের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেননি, বরং তিনি সবসময়েই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের কাজ ও কৃতিত্বের কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, 'কোনও চলচ্চিত্রকার জনগণকে বদলাতে পারে না। জনগণ মহান। তারাই নিজেদের বদলে নিচ্ছেন। আমি এই মহান বদলগুলি রেকর্ড করছি শুধু।'

১৯৭৪ সালে অসুস্থতা এবং পরপর নার্ভাস ব্রেকডাউনের মধ্যেই তিনি তাঁর অন্তিম ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' শেষ করেন। চলচ্চিত্রের যে ভাষা ও ব্যাকরণ তিনি এতদিন ধরে রপ্ত করলেন, বিকাশ ঘটালেন, শেষ ছবিতে এসে তিনি যেন এই ভাষা এবং ব্যাকরণকেই চরম দুঃসাহসভরে একেবারে নাকচ করে দিলেন। ছবিটি যে কীভাবে দর্শকদের সঙ্গে এমন গভীর ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হল, তা বোঝা কঠিন। চরিত্রগুলো যেন পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি কথা বলে এবং তাদের জবাব না দিয়ে উপায়ও নেই। নিজেদের পক্ষে বা বিপক্ষে খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে বাধ্য করে চরিত্ররা। ঋত্বিকের অভিনীত কেন্দ্রীয় চরিত্রটি তার বাস্তব জীবনকেই এমন বিদ্রুপ করে, যে দর্শকরাও ভাবতে বাধ্য হয়। চরিত্রটির সমালোচনা করা ছাড়া উপায় থাকে না তাদের। সম্ভবত ঋত্বিক আজীবন সিনেমার মাধ্যমে এটিই করার চেষ্টা করে এসেছেন। আবার অন্যদিক থেকে ভাবলে মনে হয়, তিনি হয়তো দেখতে চেয়েছিলেন, সিনেমার ভাষা হিসেবে এতদিন ধরে যা স্বীকৃত হয়ে এসেছে, একমাত্র সেসবের বেশিরভাগটাই সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যানে করেই এটি অর্জন করা সম্ভব হবে।

১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাত্র একান্ন বছর বয়সে মারা যান এই মহান চলচ্চিত্রকার। তিনি বুর্জোয়া সমালোচকদের অবহেলা পেলেন জীবনভর, প্রতিষ্ঠান তাড়িয়ে বেড়াল তাঁকে, এবং চলচ্চিত্রশিল্পের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিরা নিংড়ে নিল। আগামীতে তাঁর বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা ছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহান উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি', যার মধ্যে অন্যতম। এই কাজগুলি আর সম্পূর্ণ হবে না কখনও, তবে ঋত্বিকের নামটা বেঁচে থাকবে। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ঋত্বিক পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছেন। জনগণের দাবিতে তাঁর ছবিগুলি আবারও নতুন করে আলোচিত হচ্ছে। অতীত থেকে জনগণ এমন কিছু ফিরিয়ে নিয়ে আসছে, যা তাঁর শত্রুদের একটি গোটা প্রজন্ম মিলেও ধ্বংস করতে পারেনি। তাঁর কাজ শীঘ্রই নতুন চলচ্চিত্রকার ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

তাঁর ছবিগুলি চলচ্চিত্রে উৎকর্ষের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(মার্কসবাদী পথ ৩ জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। ভাষান্তর আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী)

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের ধারা

অরবিন্দ দাস

ভারতবর্ষ ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ। ঋতুর এত বিচিত্ররূপ আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। আদি যুগ থেকেই মানুষ বিভিন্ন ঋতুতে নানাভাবে সাড়া দিয়ে আসছে। সেইজন্য সব ঋতুতেই উৎসব আছে। ছয়টি ঋতুর মধ্যে বসন্তকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে ধরা হয়, সেই হচ্ছে 'ঋতুরাজ'। বসন্তকালে ফুলে ফলে যখন বন-উপবন ভরে ওঠে তখন মানুষের প্রাণ আনন্দময় হয়ে ওঠে। বসন্ত ঋতুর প্রাণকেন্দ্র হল বসন্ত পুর্ণিমা। শুধু পুষ্প শোভায় নয় বসন্তযামিনীর অপরূপ পূর্ণিমার মধ্যে বসন্তের লীলা প্রকাশ পায়। বসন্ত পূর্ণিমায় দোল যাত্রা পালিত হয়। দোল অর্থাৎ যাতে প্রাণ আছে। বসন্ত পূর্ণিমার এই উৎসবকে ভারতের অনেক জায়গায় হোলি বলে আবার হোরিও বলে। এই অনুষ্ঠানের প্রাচীন নাম হোলাকা বা হোলিকা। বৈদিক যুগ থেকে মধ্যযুগ ও পরবর্তীকালে ঋষি কবি ও সাধকগণ বসন্ত ঋতুকে গ্রহণ করেছেন আনন্দ উচ্ছ্বাস, ভক্তিরস ও ঈশ্বরলীলার মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ হোলিকে আপন করে নিয়েছে। এই হোলি গানের অতুলনীয় রচয়িতা হচ্ছেন বৈষ্ণব কবি চূড়ামণি সুরদাস। সুরদাস তাঁর সাধনার জীবন অতিবাহিত করেন আগ্রা মথুরার মধ্যে ব্রজমণ্ডলের মধ্যভাগে যমুনা তীরে গর্তঘাটে। বসন্ত রাগে তাঁর অপূর্ব গান রয়েছে।

রামভক্ত তুলসীদাসের বসন্ত সংগীত হোলি ভক্তদের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত। বসন্ত উৎসব শুধু যে হিন্দুদের উজ্জ্বল করেছে তা নয়, ভারতের মুসলমান বংশীয় বহু সাধক এই উৎসবকে আপন করে মহীয়ান করে গেছেন। মুসলমান বংশীয় সাধক কবীর, দাদু, রজ্জব, গরিবদাস, দরিয়া সাহেব, শাহলতিফ, বুল্লেশাহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শুধু হিন্দু-মুসলমান ধর্মে নয় শিখধর্মের গুরু নানক বসন্তকে নানাভাবে আহ্বান করেছেন। প্রসঙ্গত 'গ্রন্থসাহেব' তো আগাগোড়া গীতময়-বাদ্যযন্ত্র সহ গায়ক দ্বারা পরিবেশিত হয়। 'গ্রন্থসাহেব'-এর একটি পরিচ্ছদ বসন্ত রাগে। তাঁর রচিত বসন্তের গানগুলিও একেবারে ফুলে ফলে ভরপুর। শিখ সম্প্রদায় হোলি উৎসবকে' হোলা মহল্লা'; বলেন।

Scanned with OKEN Scanner

হোলি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নাম করতে হয় ভক্ত আবদুর রহিম খাঁনখানার। ইনি ছিলেন সম্রাট আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানের পুত্র এবং আকবরের মন্ত্রী। সুফি মতবাদে বিশ্বাসী। আকবর অত্যন্ত ভাগ্যবান যে এমন একজন মানুষকে মন্ত্রীরূপে পেয়েছিলেন। মহান এই কবির লেখা কৃষ্ণ, রামের সংগীত ও কবিতা গভীর অনুরাগের সাহিত্য। তাঁর কবিতা দেখে কে বুঝবে যে ইনি জন্ম বৈষ্ণব কবি নন। আবদুর রহিম বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হলেও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু হোলি প্রসঙ্গে রহিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'মদনাষ্টক' কাব্যের জন্য তিনি বিখ্যাত। অর্থাৎ আটটি শ্লোক বিশিষ্ট কৃষ্ণবন্দনা। এটি উত্তর ভারতের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দুকেও হোলির দিনে পাঠ করতে হয় বা শুনতে হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে হোলির দিনে সকালে ছেলে-ছোকরারা উৎসব নিয়ে মাতামাতি করে। তারপর বিকেলে প্রবীণ মানুষরা ধীরস্থির শান্তভাবে হোলি উৎসব করেন। গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্রাহ্মণ বা গ্রামের প্রধান পুরোহিত 'মদনাষ্টক' ভক্তিভরে পাঠ করেন ও অন্য সকলে মন দিয়ে শোনেন। এই শ্লোকে রহিম শ্রীকৃষ্ণের জ্যোৎস্নাবিহার, মদনমোহন রূপ, চিত্তের ব্যাকুলতা চমৎকারভাবে এঁকেছেন। তিনি যেন পাঠানকন্যা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মেতে উঠেছেন। অষ্টশ্লোকের একটি শ্লোক দেওয়া হল

'শরদ, নিশি-নিশীথে চাঁদকী রোশনাঈ
সঘন-বন-নিকুঞ্জে কানহ বংসী বজাঈ।
রতি, পতি, সূত, নিদ্রা, সাইয়াঁ ছোড় ভাগী
মদন শিরসি ভুয় ক্যা বলা আন লাগী॥'

(অনুবাদ : শরতের চন্দ্রালোকিত রাতে সঘন নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে প্রেমিক, স্বামী, পিতা, পুত্র ছেড়ে সখিরা ঘর ছেড়েছে। হায় আমিও যদি কৃষ্ণপ্রেমে এইভাবে ঘর ছাড়তে পারতাম।)

এতক্ষণ সংক্ষেপে আলোচিত হল বিশ্ব প্রকৃতির ঋতুর আবর্তন বিশেষ করে বসন্ত ঋতুকে ভারতের কবি, সাধকরা কীভাবে সাদরে গ্রহণ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও ঋতু ভাবনার সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত ঋতু সঙ্গীতগুলিতে। শৈশব থেকেই বিশ্ব প্রকৃতির রূপ কবির কাছে পরম বিস্ময়ের ও উপভোগের বস্তু ছিল। নিতান্ত কৈশোরের ভানুসিংহের পদাবলীতে বসন্ত বর্ণনায় বিদ্যাপতির প্রভাব পড়েছিল। কবি বলেছেন

বসন্ত আওল রে
মধুকর গুণ, গুণ অজুয়ামঞ্জরী কানন ছাওল রে।

বসন্তকে যৌবনের প্রতীক রূপে গ্রহণ করার অভিপ্রায় আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাই। কবির কাব্য যতই পরিণত হয়েছে বসন্তঋতুও ততই বহুমাত্রিক হয়ে ধরা দিয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যের 'বসন্ত' কবিতাতে বসন্তকে পুরুষরূপে বা মানবচরিত্র রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যিনি পীতাম্বর পরিহিত, যাকে পরবর্তীকালে বসন্তের গানে বার বার দেখা যায়। আবার যৌবনরূপী বসন্তের এই পুরুষটিকে পাই'রাজা' নাটকে যেখানে অদৃশ্য রাজ্যের রূপকল্পনায় রানি সুদর্শনা বলছেন 'বসন্তকালে এই যে, সমস্ত বন রঙে রঙিন, তখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুন্তল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বাণীর সব কটি তার উতলা।' বসন্তকে কবিগুরু জরা ও যৌবনের, পটভূমিকায় দেখতেন। এই ভাবনা থেকেই তিনি 'ফাল্গুনী' নাটকে মানবজীবন আর নিঃসর্গ প্রকৃতিকে এই সমগ্রতায় বরণ করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' এর আদর্শে বসন্ত ঋতুর গান নিয়ে রচনা করেন 'বসন্ত' গীতিনাট্য। এই 'বসন্ত' গীতিনাট্য তিনি উৎসর্গ করেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে। সেই সময় নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মূলকথা ছিল শিশুমনে সুকুমার বৃত্তির উন্মোচন ঘটানো। প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রকৃতিকে ভালোবেসে মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত হচ্ছে শিক্ষার অঙ্গ, কারণ এই গানের মধ্যে আছে কোন ফুল কোন ঋতুতে ফোটে। এযেন প্রকৃতি পরিচয়ের পাঠ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বই গীতবিতান গানের পর্যায় বিভাগে বসন্তের গান আছে ৯৬টি। এছাড়া প্রেম পর্যায়ের বসন্ত অনুষঙ্গ ৮৪টি গান এবং পূজা পর্যায়ে বসন্তের অনুষঙ্গ আছে ৩১টি গান। এই সমস্ত গানগুলির সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র এনেছেন বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গানই রচিত হয়েছে আশ্রম প্রবর্তিত ঋতু উৎসবে, গীতিনাট্যকে অবলম্বন করে।

সত্যি কথা বলতে কী যাকে ঋতু উৎসব বলে তার প্রবর্তক হচ্ছেন কবিগুরুর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭) সালে তার উদ্যোগে এই ঋতু উৎসব শুরু হয়। শমীন্দ্রনাথ ও অন্য দুজন ছাত্র বসন্ত, একজন ছাত্র বর্ষা ও আর তিনজন শরৎ সেজে ছিল। যেহেতু বসন্তে ফুল বেশি হয় তাই সকলে ফুল দিয়ে সেজে ছিল। শমীন্দ্রনাথ 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' গানটি গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন 'শান্তিনিকেতনে ঋতু উৎসবের ইহাই প্রথম অর্ঘ্য' দুর্ভাগ্যের বিষয় এই উৎসবের পর শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার বলেছেন, শমীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ছোট ছিলেন তাই বিশুদ্ধ আনন্দ প্রকাশই ছিল এই উৎসবের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য। আশ্রমে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নয় মাস পর রবীন্দ্রনাথ শমীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষা উৎসবের দায়িত্ব দেন ক্ষিতিমোহন সেনকে।

জোড়াসাঁকোতে শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ দোল উৎসব হতে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণে আমরা তার কোনও বর্ণনা পাই না। তবে ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এই দোল উৎসবের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতিচারণ গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি, বসন্তোৎসব হচ্ছে শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল। ঠিক কবে শুরু হয় এই উৎসব। আগে দোলের দিন আবির খেলা হত এবং আশ্রমিকরা সকলে গুরুদেবকে আবির দিত। তবে এখানকার মতো তখনও নাচগানে ভরপুর ছিল না। সঠিক ঐতিহাসিক

Scanned with OKEN Scanner

দলিল পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্রজীবনীকারের এক বিবরণ থেকে জানা যায় ১৯১৫ সালে আশ্রমের 'ছেলে বুড়ো'দের অনুরোধে বসন্ত উপলক্ষে ছোটদের জন্য নাটক লেখেন। এই সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিন্জ দিল্লি থেকে বাংলায় আসেন। এই উপলক্ষে কবিরও আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু বসন্তের গান রবীন্দ্রনাথের মনে ঘুরছে। তিনি এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সুরুলে একান্তে 'বসন্তোৎসব' নাটিকাটি লেখেন।

দোলে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাব রবীন্দ্রনাথের কোনওদিনই পছন্দ ছিল না। তিনি এই উৎসবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনতে চাইলেন। এই বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'স্মৃতি ও সঞ্চয়' বইতে লিখছেন 'উনি (রবীন্দ্রনাথ) ভাবলেন, এটাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিতে হবে। উনি সকালে 'বসন্তোৎসব' বলে একটা বিধিবদ্ধ উৎসব করা ঠিক করলেন। তখন থেকে আরম্ভ হল সকালবেলার অনুষ্ঠান-তাতে গান হবে, কিছু নাচ হবে-ছেলেমেয়েরা নাচবে, গুরুদেব আবৃত্তি করবেন। তখন থেকে 'ওরে গৃহবাসী' গানটার সঙ্গে নানারকম অর্ঘ্য নিয়ে মেয়েরা আসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 'ওরে গৃহবাসী' গানটি লেখা হয়েছিল ১৯৩১ সালে (বাংলা ১৩৩৭ ফাল্গুন) 'নবীন' গীতিনাটিকার জন্য। বসন্তোৎসবে এই গান প্রসেশনের (Pro-cession) গান হিসাবে সংযোজন হয়। তবে এই গানের শোভাযাত্রায় ১৯৩৪ সালে নাচ যুক্ত হয়। এই নাচের ভঙ্গি কী হবে তা ঠিক করেন শান্তিদেব ঘোষ। তিনি লিখছেন 'আমি ঠিক করলাম, মণিপুরী একটু সিম্পল 'স্টেপ' ছেলেমেয়ের সাজসজ্জার দিক দেখতেন নন্দলাল বসু। হাতে তালপাতার ডালি তৈরি করে তাতে ফুল, আবির রাখা হত। অনুষ্ঠানে সমবেত ও একক নৃত্য হত। এইভাবেই নানারকম শৈল্পিক ভাবনা যুক্ত হয়ে বর্তমানে এই রূপ দাঁড়িয়েছে। ১৯৪১ সালের (১৩৪৭) বসন্তোৎসব গুরুদেবের জীবনে শেষ বসন্তোৎসব। কবির স্থানান্তর বারণ, ঘরে অন্তরীণ তবু উৎসব যাতে যথাযথ হয় তার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন শৈলজারঞ্জন ও শান্তিদেব ঘোষকে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, বসন্তোৎসব।

শেষ কবিতা 'জন্মদিন' কবির বসন্তোৎসবে না থাকার বেদনার সুর বেজেছে এই কবিতায়। কবি যেন মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়ে জীবনপ্রবাহকে আহ্বান করছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু বসন্ত নয় ছয়টি ঋতুর গানগুলির মাধ্যমে মানবজীবন এবং নৈসর্গিক ঋতুবৈচিত্র্যের অন্তর্লীন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :
১. অবনীন্দ্র রচনাবলী-১ম খণ্ড।
২. রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩. স্মৃতি ও সঞ্চয়। শান্তিদেব ঘোষ।
৪. প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ-অনুত্তম ভট্টাচার্য।
৫. ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা। আচার্য ক্ষিতীমোহন সেনশাস্ত্রী

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন

মজিবুর রহমান

শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান তিন স্টেকহোল্ডার বা অংশীদার হল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। শব্দের গঠন থেকেই পরিষ্কার, 'শিক্ষা'র সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রয়েছে 'শিক্ষক' 'শিক্ষার্থী'র। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার আদানপ্রদান সুসম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অভিভাবক। শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। পরিবর্তনশীলতার জাগতিক নিয়ম মেনে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন যেমন হয়েছে তেমনি তার প্রধান তিন অংশীদারের পারস্পরিক সম্পর্ক বদলেছে।

প্রাচীন ভারতে আজকের মতো একাধিক স্তরবিশিষ্ট বিদ্যালয় ছিল না। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুকুল বা গুরুর আশ্রম ছিল একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। আজকের দিনের'শিক্ষক'; 'শিক্ষার্থী' তখনকার দিনে ছিলেন যথাক্রমে 'গুরু' 'শিষ্য'। শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীরা গুরুর সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করত। অর্থাৎ, গুরুকুল ছিল এক ধরনের আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থা। শৈশব থেকে কৈশোরের মধ্যে এই পাঠ প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকত। গুরুকুলে দেশ-দুনিয়ার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা সমাজ বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কম অনুভূত হত। গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত মূল্যবোধ ও নীতিশিক্ষা গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হত। ভালো চরিত্রের মানুষ হওয়াকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা হত। ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের প্রতি শিক্ষার্থীরা মনোযোগী থাকতো। তারা পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতো। ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সচেষ্ট হতেন। গুরু শিষ্যদের বিতর্ক সভা সঞ্চালনা করতেন। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা থাকতো। সকলেই সংযম, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-স্নেহ সহযোগে গড়ে উঠতো। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের আন্তরিকতা থাকতো। অভিভাবক শিক্ষকের ওপর সন্তানকে'মানুষ' করার দায়িত্ব সঁপে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। গুরু ছিলেন শিষ্যের 'ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড'। গুরুর জন্য শিষ্য কঠিন কষ্ট করতে প্রস্তুত থাকতো। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, শিষ্যের কোলে মাথা রেখে গুরু শুয়ে আছেন। সেই সময় একটা বিছা পোকার দংশনে শিষ্যের শরীর থেকে রক্তপাত হতে থাকলেও সে নড়াচড়া করছে না পাছে গুরুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙুল দাবি করেন। একলব্য বিনাবাক্যে গুরুকে তা দিয়ে দেন যদিও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে গুরু-শিষ্য ছিলেন না। দ্রোণ তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যের ধনুর্বিদ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত রাখতেই এমন অপকৌশল অবলম্বন করেন।

Scanned with OKEN Scanner

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছেলের গৃহশিক্ষক একদিন পা ধুচ্ছিলেন। মগ থেকে জল ঢেলে তাঁকে সাহায্য করছিল সেই রাজপুত্র ছাত্রটি। সম্রাট দৃশ্যটা দেখেন এবং মাস্টারমশাইকে দরবারে ডেকে পাঠান। মাস্টারমশাই দুরুদুরু বুকে যান। সম্রাট আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, মাস্টারমশাই তাঁর ছেলেকে সুশিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সম্রাট বলতে চান, তাঁর ছেলের উচিত ছিল, শুধু জল ঢেলে সাহায্য করা নয়, নিজের হাতে মাস্টারমশাইয়ের পা ধুইয়ে দেওয়া। একজন দৌর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটও অভিভাবক হিসেবে মনে করেন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর সর্বাধিক আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রকৃতির কোলে পাশাপাশি বসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠন চলতো। শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের ভালোমন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সবকিছুর মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকতো।

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার সংস্কার সাধন করা হয়। একাধিক স্তরবিশিষ্ট বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পাঠক্রমে নানাবিধ বিষয় সংযুক্ত করা হয়। তবে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছিল, এমন কথা বলা যাবে না। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সময় সাক্ষরতার হার ছিল মোটামুটি ১২ শতাংশ। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন ছিল বিলাসিতা। শিক্ষকরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতেন। অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতেন। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের একটা সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে উঠতো।

স্বাধীন ভারতে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়। আমাদের বঙ্গে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের যথাযথ ভূমিকা পালনের ধারাবাহিকতা সত্তরের দশক পর্যন্ত বজায় থাকতে দেখা যায়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কড়া শাসনে রাখতেন। পড়ুয়ার পড়াশোনায় অমনোযোগ অথবা চারিত্রিক ত্রুটি দেখলেই শিক্ষক শাস্তি প্রদান করতেন। চড়, থাপ্পড়, বেত্রাঘাত- যেমন অপরাধ তেমন সাজা। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হলেও পড়ুয়ারা তা নতমস্তকে গ্রহণ করত। কখনও প্রতিবাদ করার কথা ভাবতে পারত না। বাড়িতেও জানানোর সাহস করতো না কারণ অভিভাবক শিক্ষকের পক্ষ নিতেন। অভিভাবকরা বিশ্বাস করতেন, শাসন ছাড়া শিক্ষা সুসম্পন্ন হয় না। শাসন না করলে সন্তান গোল্লায় যাবে। 'স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড'। তাঁরা এটাও জানতেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষকরা যথেষ্ট স্নেহ করেন ও সন্তান জ্ঞানে ভালোবাসেন। সুতরাং তাঁদের শাসন করার অধিকার রয়েছে। কথায় আছে- ''শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।'' ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক খুব ভালো থাকার ফলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুন্দর একটা পরিবেশ বিরাজ করেছে। সেখানে লেখাপড়াই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও শিক্ষকদের স্যালারি সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিকক্ষে দুর্দান্ত পঠনপাঠন হয়েছে এবং পড়াশোনার মান উন্নত থেকেছে। শিক্ষক দরদ দিয়ে শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থী একাগ্রচিত্তে শিখেছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার্জন বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে সাঙ্গ হয়েছে। পড়ুয়াদের প্রাইভেট টিউশন কিংবা কোচিং সেন্টারে ছোটাছুটি করার প্রয়োজন পড়েনি।

গত দুই-তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল উঠে গেছে। নবম-দশম শ্রেণি মিলিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অতীত হয়েছে। মাধ্যমিকে পাশ নম্বর কমানো হয়েছে। প্রশ্নপত্রে 'ব্রড কোশ্চেন' কমিয়ে 'শর্ট কোশ্চেন' বাড়ানো হয়েছে।'হল ম্যানেজ'-এর সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কম লিখে ও কম শিখে বেশি নম্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো শিক্ষার মান সুরক্ষিত রাখার সহায়ক হয়নি। অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক পদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। অনুমোদিত পদেও নিয়োগ বন্ধ থাকছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে বিতর্ক চলছে। এতে তাঁদের সামাজিক সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাঁদের পক্ষে মাথা উঁচু করে কাজ করা কঠিন হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গন শিক্ষা বহির্ভূত বহুবিধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বছরভর '-শ্রী'; ও'-সাথী'; প্রকল্প রূপায়ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকদের 'নোডাল টিচার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক 'এনার্জি' শেষ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের 'ক্যাশ ও কাইন্ড'-এর প্রতি। পড়াশোনায় তাদের মন নেই। এর ফলে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কমেছে। অভিভাবকরাও 'খিচুরি খাওয়া' স্কুলে সন্তানের সুশিক্ষার আশা ত্যাগ করেছেন। তাদের যাবতীয় আগ্রহ এখন 'অনুদান' নিয়ে।সবমিলিয়ে পাঠশালায় পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন গৌণ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থী শিখতে চেষ্টা করছে না। শিক্ষক শেখানোর তাগিদ অনুভব করছেন না।

শিক্ষার্থী যেমন 'গুড বয়' বা 'গুড গার্ল' শব্দবন্ধ শোনার জন্য আকুল নয় তেমনি শিক্ষক 'সুশিক্ষক' হওয়ার জন্য ব্যাকুল নন। শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কেউই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস পায় না। কোনরকমে 'সিলেবাস' শেষ হলেই হল! সবই হচ্ছে ওপর ওপর। গভীরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। পঠনপাঠন ঢিলেঢালা হওয়ার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্কও শিথিল হয়ে পড়ছে। এজন্য শিক্ষাঙ্গনে অনভিপ্রেত ও অপ্রীতিকর ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা মারপিট করছে। স্টাফ রুমে শিক্ষকরা হাতাহাতি করছেন। কখনও কখনও মল্লযুদ্ধে আহত হয়ে হসপিটালাইজড হচ্ছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রহার করলে পাল্টা প্রহৃত হচ্ছেন। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় ঘটছে না। শিক্ষকরা কাউকে পাশে পাচ্ছেন না।

Scanned with OKEN Scanner

শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করতে হবে। শিক্ষার স্বার্থেই এটি করা দরকার। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধুমাত্র বাঁচিয়ে রাখা নয়, এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো জরুরি। সংশ্লিষ্ট সকলকেই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষা বহির্ভূত কাজ যতই থাকুক, কোনোভাবেই পড়াশোনাকে অবহেলা করা চলবে না। এজন্য শিক্ষকদের সবসময়সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের থেকে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁদের কাছে সমাজের অনেক প্রত্যাশা। তাঁদের বিচ্যুতি বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য মোবাইলে মশগুল না থেকে স্টাফ রুমে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্টাফ রুমের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। পাঠদান সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক অথবা সাংগঠনিক পদের সাহায্যে বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা না করে একজন পাঠদানকারী শিক্ষক হিসেবে অবদানকে আপন সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যেতে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের মান উন্নত করতেই হবে। পাঠদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বোধশক্তি বাড়ানোর দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, ভবিষ্যতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ভালভাবে লেখাপড়া শেখাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ব্যর্থতায় একটা দায় অনুভব করতে হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় বসতে হবে। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েই অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সন্তানের সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে অভিভাবককেই সর্বাধিক সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে 'শারীরিক শাস্তি' দিতে পারবেন না, এমন বিধান অপসৃত হওয়া উচিত। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যেই কখনও কখনও ভর্ৎসনা ও প্রহার করেন যেমন বাড়িতে মা-বাবা করে থাকেন। শিক্ষককে 'শ্রেণি শত্রু' বানানোর চেষ্টা হলে তা সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে না। বর্তমান প্রজন্মকে আগামীদিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সম্পর্ক সুসংহত ও সুমধুর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

(লেখক কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলের কথা

কৌশিক বাগচী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কোনও ছাত্রের মধ্যে বৈষম্য করি না। ক্লাসে রাজনীতিটা যেটা হয়, সেটা কালচারাল পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। সেখানে কে কোন দলের সদস্য আমরা জানিও না। আমি জানতে চাইও না। কোনও প্রয়োজন হয় না। আমি ইংরেজি বিভাগের কথা বলছি অবশ্য।

যাদবপুরে রাজনীতি হয়! হ্যাঁ হয়। তাতেই কিন্তু যাদবপুর আজ যাদবপুর। মিডিয়া শুধু ঝামেলা কভার করতে আসে। এরা কী জানে, আমাদের ক্লাসগুলোতে প্রতিদিন ছাত্রদের জ্ঞান দেখে অবাক হতে হয়। ডিবেট করতে ভাল লাগে। ক্রিয়েটিভিটি দেখলে মাথা ঘুরে যায়। কমিউনিকেশন স্কিল অতুলনীয়।

এদের সবাইকে গুণ্ডা বদমাশে পরিণত করবেন না।

বিদেশ থেকে যখন আমার অ্যাকাডেমিক বন্ধুরা আসেন, তাঁরা শুধু ঘুরে ঘুরে যাদবপুরের ম্যুরাল, গ্রাফিতি, শ্লোগান যা দেওয়ালে দেওয়া আছে, সেগুলোর ছবি তুলতে থাকেন। কেন?

কারণ Hyper Capitalist Global North-এ ওইসব ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ। তাতে ফল কি হয়েছে? সব কপোর্রাইজড হয়ে গিয়ে শিক্ষকরা যখন তখন বিতাড়িত হচ্ছেন, ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছেখ কেউ প্রতিবাদ করার নেই। ভিয়েতনাম নিয়ে আন্দোলন হওয়া মুশকিল এখন আমেরিকাতে। কিন্তু মনে আছে সেটা কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতেই দানা বেঁধেছিল? তাতে একটা রেভলিউশন আসে!

এই যে LGBTQ community– তারা কি জানে তারা আজ এই আন্দোলনের জন্য যতটাই হোক স্বাধীনতা পেয়েছে? হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে একটি মেল আসে কাকুতিমিনতি করে।

'আমায় recommendation দিন। আমি চাকরি হারাতে বসেছি।' উনি সমস্ত International Academic-দের কাছ থেকে recognition চাইছিলেন, যাতে প্রমাণ করতে পারেন, তার চাকরিটা থাকা কেন দরকার! আমি ওনার সঙ্গে Heidelberg ~ একটি Thesis co-supervise করেছিলাম। তাই যাদবপুরে রাজনীতি না হলে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হবে।

তখন অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েকে পাঠিয়ে ৬ লক্ষ টাকা দিয়ে ইংরেজি অনার্স পড়াবেন! এডুকেশন লোন আপনার আর আপনার সন্তানের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। তখন বুঝবেন রাজনীতি কেন হয়!

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিভিন্ন সূত্রে কখনো ছাত্র গবেষক, কখনো অতিথি অধ্যাপক আবার কখনো সাম্মানিক অধ্যাপক, যুক্ত আছি সেই ১৯৮৩ সাল থেকে। বিজ্ঞান ও ইনজিনিয়ারিং ছাত্রদের মেধা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি। মানব বিজ্ঞান শাখাও দেশের সেরা, আন্তর্জাতিক মানের। বিগত ১৫ বছরে যাদবপুরের পাঁচজন ছাত্রের গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ হয়েছে। এদের খুব কাছে থেকে দেখেছি। হ্যাঁ এরা ক্লাস ফাঁকি দেবার ফন্দি করে, রাজনীতি করে। সাথে সাথে সংস্কৃতি ও মননের চর্চা করে। পেশাগত কারণে ভারতের এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে, তাদের মেধা নিয়ে কোন প্রশ্ন করব না। এমনকি যে JNU নিয়ে এত চর্চা হয়, সেখানের বিজ্ঞান শাখার

Scanned with OKEN Scanner

ছাত্রদের মধ্যে পঠনপাঠনের বাইরে যে মনন চর্চা তার খোঁজপাইনি। তাই যাদবপুর ভারতবর্ষে একটি অনন্য বিশ্ববিদ্যালয় NAAC এর শিলমোহর বাদ দিলেও। এই সহজ সত্যটি মেনে নিয়েই যাদবপুরের সমালোচনা করতে হবে। হুংকার ভয় যত দেখাবে, যাদবপুর অটল থাকবে। ভবিষ্যতে কেউ বা কারা যদি মনে করে যাদবপুরকে ঠান্ডা করে দেবে, অন্ত্যন্ত ভুল করবে। আগুন নিয়ে বালখিল্যতা থেকে বিরত থাকুন। (লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

ট্রাম্পকে কি বললেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রিয় আমেরিকাবাসী, আপনাদের ভূগোল সম্পর্কে খুব বেশি জানা নাই তাই বলছি, আমেরিকা আপনাদের দেশ, কিন্তু মহাদেশ নয়। তাই এটা জানা অত্যন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ যে আপনারা বিভেদের প্রথম ইঁট রাখার আগে জেনে নিন, এই প্রাচীরের ওপারে ৭ বিলিয়ন মানুষ আছে। কিন্তু যেহেতু আপনারা সত্যিই 'মানুষ' শধটি জানেন না, তাই আমরা তাদের 'ভোক্তা' বলব। এই ৭ বিলিয়ন গ্রাহক ৪২ ঘন্টারও কম সময়ে তাদের আই ফোনকে স্যামসাং বা হুয়াওয়ে ডিভাইস দিয়ে বদলাতে প্রস্তুত। তারা লেভিসের বদলে জারা বা ম্যাসিমো দত্তিও নিতে পারে।

ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে, আমরা সহজেই ফোর্ড বা শেভ্রোলেট গাড়ি কেনা বন্ধ করতে পারি এবং এর পরিবর্তে টয়োটা, কিয়া, মাজদা, হোন্ডা, হুন্ডাই, ভলভো, সুবারু, রেনল্ট বা বিএমডাব্লু বেছে নিতে পারি, যা প্রযুক্তিগতভাবে তাদের উৎপাদিত গাড়ির চেয়ে ভাল। তারা ডাইরেক্ট টিভিতে সাবস্ক্রাইব করা বন্ধ করতে পারে, এবং আমরা তা করতে চাই না, কিন্তু আমরা হলিউডের সিনেমা দেখা বন্ধ করতে পারি এবং বেশি করে ল্যাটিন আমেরিকান বা ইউরোপীয়প্রযোজনা দেখতে শুরু করতে পারি, যেগুলোর উন্নতমানের, বার্তা, সিনেমাটিক কৌশল এবং বিষয়বস্তু রয়েছে।

যদিও এটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, আমরা ডিজনি ছেড়ে যেতে পারি এবং কানকুন, মেক্সিকো, কানাডা বা ইউরোপের এক্সক্যারেট রিসর্টে যেতে পারি দক্ষিণ, পূর্ব আমেরিকা এবং ইউরোপে অন্যান্য দুর্দান্ত গন্তব্য রয়েছে। এবং এমনকি যদি আপনি এটি বিশ্বাস না করেন তবে ম্যাকডোনাল্ডসের চেয়ে মেক্সিকোতে আরও ভাল বার্গার রয়েছে এবং তার মধ্যে আরও ভাল পুষ্টির উপাদান রয়েছে।

আমেরিকায় কেউ কি পিরামিড দেখেছেন? মিশর, মেক্সিকো, পেরু, গুয়াতেমালা, সুদান এবং অন্যান্য দেশে অবিশ্বাস্য সংস্কৃতির সাথে পিরামিড রয়েছে। জেনে নিন প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়গুলো কোথায় আছে... এসব কিছুই আমেরিকায় নেই... ট্রাম্পের জন্য লজ্জা, তিনি এসব কিনতেন এবং বিক্রি করতেন!

আমরা জানি যে অ্যাডিডাসের অস্তিত্ব রয়েছে, কেবল নাইকি নয়, আমরা পানামের মতো মেক্সিকান টেনিস জুতো পরা শুরু করতে পারি। আমরা যা ভাবি তার চেয়ে অনেক বেশি জানি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে এই ৭ বিলিয়ন ভোক্তারা যদি তাদের পণ্য না কেনে তবে বেকারত্ব হবে এবং তাদের অর্থনীতি (বর্ণবাদী প্রাচীরের মধ্যে) এতটাই ভেঙে পড়বে যে তারা এই কুৎসিতপ্রাচীরটি ভেঙে ফেলার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করবে। আমরা এটা চাইনি কিন্তু.. আপনারা দেয়াল চান, দেয়ালই পাবেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ।

মেক্সিকোর মতো ছোট দেশের প্রেসিডেন্ট যে সাহস দেখাতে পারে, আমেরিকার পায়ে সার্বভৌমত্ব আর দেশের সম্মান বিকিয়ে দেওয়া আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকারের সেই সাহস হয় না। অবশ্য হবেই বা কী করে ? যাদের জন্ম ইতিহাস ব্রিটিশদের আগাপাশতলা চাটার। প্রায় ৪০-৪৫ কোটি উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের বাজার যদি মার্কিন কোম্পানিগুলোর হাতছাড়া হয় তাহলে ওরাই নিজেদের দেশের প্রেসিডেন্ট চাপ দেবে তার বদলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে আর ৫৬ ইঞ্চির বিশ্বগুরু নির্লজ্জতার চূড়ান্ত উদাহরণ রেখে মৌনীবাবা হয়ে যান। অন্যদিকে ফেসবুকীয় চাড্ডিরা নিজেদের প্রবাসী 'হিন্দু' ভাইবোনদের দোষারোপ করে ততোধিক নির্লজ্জভাবে নামে ট্রাম্পের সেবাদাস মৌনীবাবার সমর্থনে।

নরেন্দ্র মোদীর ডিগ্রি একটা মিথ্যা ঢাকতে হাজারটা মিথ্যা

অমিতাভ সিংহ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর বি.এ ও এম.এ ডিগ্রি জনগণের সামনে নিয়ে আসার বিষয়ে বার বার দুবার , কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের নির্দেশ অমান্য করল দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় মোদীর স্নাতক বা বি.এ ডিগ্রির বিষয়ে তথ্য গোপন করতে চেয়ে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করেছিল । সব কাজ ফেলে দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এরকম একটা সাধারণ মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে সওয়াল করলেন। এর আগে সলিসিটর জেনারেল কোনও দিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে কোনও মামলায় লড়েছেন বলে খবর নেই। মেহতার যুক্তি ছিল ১৯৭৮ সালের বি.এ পাশ করা ছাত্রদের নাম,রোল নম্বর, তাদের পাস ফেলের তথ্য ও প্রাপ্ত নম্বর জনসাধারণকে দেখানো যাবে না। তা করলে নাকি অন্যের ব্যাক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়ে যাবে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন তৃতীয়পক্ষকে তা জানাতে পারবে না। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তো প্রায়শই বলে থাকেন তাঁর নিজস্ব কোন পরিবার নেই। গোটা দেশই পরিবার। আর তাঁর জীবন খোলা

Scanned with OKEN Scanner

পাতার মতন সাদা। তাহলে তাঁর ডিগ্রি সম্পর্কে তথ্য দেশের একজনকে দেখাতে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এই তথ্য তো দেশের সুরক্ষার পক্ষে কোন ক্ষতিকারক তথ্য নয়। এই ডিগ্রি তো পাবলিক তথ্য বলে স্বীকৃত। চাকরি করতে গেলে এই ডিগ্রি দেখাতে হয় না? কখনও কোনও কারণে ডিগ্রি যাচাই (ভেরিফাই) করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থার কাছে কতজন শরণাপন্ন হয় তখন কি উক্ত সংস্থাটি তা জনসমক্ষে আনে না? তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? গত আট বছর ধরে যে বিষয় নিয়ে দেশের মানুষেরা এতটা সন্দেহ পোষণ করছেন তার জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেন মোদীর জন্য বার বার মামলা করতে হবে জনগণের করের টাকায়? কেনই বা দেশের সবচেয়ে দামী সরকারী উকিলকে এই বিষয়ে ভাড়া করতে হবে?

একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ২০১৬ সালে নীরজকুমার নামে এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর স্নাতক পরিক্ষার সংশাপত্র দেখতে চেয়ে তথ্য কমিশনারের কাছে আবেদন করেন। কমিশন তখন জানায় যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এবিষয়ে জানতে আবেদন করতে পারেন। এরপর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই নির্দোশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করে। এটা কি আদৌ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হতে পারে? হাইকোর্টও প্রাথমিকভাবে এই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। এই মামলার শুনানি হল গত ২৭ফেব্রুয়ারি। যদিও বিচারপতি শচীন দত্ত রায়দান স্থগিত রেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী দেশের মহান সলিসিটর জেনারেল বলেন তথ্যের অধিকার আইন তথ্য জানার জন্য,কারও কৌতুহল নিবারনের জন্য নয়। প্রয়োজনে এই তথ্য আদালতে জানানো যেতে পারে বলে তিনি বলেন। নীরজকুমারের আইনজীবী বলেন আগে তো পরীক্ষার ফলাফল ও পরীক্ষার্থীর নাম সংবাদপত্রে, নোটিশবোর্ডে প্রকাশিত হত। আমরাও দেখেছি গেজেট প্রকাশ হতে। কারণ তখন তো আর নেট ছিল না। সুতরাং এটা তো কোন গোপন নথি নয়। তাছাড়া তো মোদীসাহেব একাধিক পুরানো সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন যে তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান নি। কখনও বা বলেছিলেন তিনি রেলস্টেশনে চা বিক্রি করতেন। আবার এও বলেছেন তিনি নাকি জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর ভিক্ষা করেছেন। যদিও কয়েকটা সাদা কালো ছবিতে দেখা গেছে তার বিদেশে আরএসএসের প্রচারক হিসাবে কাজ করতে।

আসলে গন্ডগোলটি পাকিয়েছেন খোদ মোদীসাহেবই। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হঠাৎ তিনি দাবী করতে আরম্ভ করেন তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি এবং গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্টায়ার পলিটিকাল সায়েন্সে এমএ ডিগ্রি লাভ করেছেন।যদিও গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা জানিয়েছিলেন এরকম কোন বিষয় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না। এই বিষয়ে ডিগ্রি পেয়েছেন সেরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমনকি কখনও তার কোন সহপাঠীকেও টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যায় নি। কেউ বিখ্যাত হয়ে গেলে স্বভাবতই তার পুরানো সহপাঠী ও বন্ধুরা অন্তত দুএকবার দেখা করতে আসেন। এরকম কাউকে গত ত্রিশ বছর তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বলে শোনা যায় নি। অথবা সেরকম কেউ তার সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন বলে দাবীও করেন নি।

অন্যদিকে ২০১৬ সালের ৯ মার্চ রীতিমত সাংবাদিক সম্মেলন করে অমিত শাহ ও অরুন জেটলী মোদীর দুটি পরীক্ষার শংসাপত্র দেখিয়েছিলেন। সেসময় অমিত শাহ বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি সার্বজনীন করা হল।তাহলে কেন আজ সলিসিটর জেনারেল বলছেন এটা একান্তই ব্যক্তিগত,যে কোন মানুষকে (আজনবী) দেখানো যাবে না। এরপর তো শুরু হল আসল খেলা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া শংসাপত্রে পরিক্ষার বছর ও নামে গুরুতর ভুল ছিল। তাদের দেওয়া শংসাপত্রের নীচের দিকে একটা কোড নম্বর দেওয়া থাকে তা মোদীর শংসাপত্রে ছিল না। আবার গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্রটি ছিল কম্পিউটার দ্বারা ছাপা। তখন তো দেশে কম্পিউটারের চল একেবারেই ছিল না। তখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কবে বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার কিনেছে তা জানাতে। বিশ্ববিদ্যালয় জানালো এই কম্পিউটার নাকি উপহার হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য কে কবে কেন এই উপহার দিয়েছিল তা তারা জানাতে পারে নি। সুতরাং সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠলো। একই কারণে আপের অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তো গুজরাট হাইকোর্ট ২৫০০০ টাকা জরিমানা পর্যন্ত করে দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কনভোকেশন করে ডিগ্রি দেয় যাতে ছাত্র ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। তারা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে যে এই এই নামী ব্যাক্তিরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। সেরকম তো কিছু এখনও দেখা যায় নি এতদিন।সবকিছুতেই এত গোপনীয়তা কেন? তাহলে মোদীসাহেবের জীবন তার দাবীমতো খোলা বই নয়।

আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীরা এইসব কনভোকেশন বা সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন, প্রধানমন্ত্রীও যান। ২০১৬ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে সন্মানজনক এলএলডি উপাধি দিতে চাইলেও তিনি তা তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। একইবছর আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি তিনি নিতে পারেন নি। কারণ একটাই সেক্ষেত্রে তাকে পূর্বে পাওয়া সব ডিগ্রির বিশদ তথ্য দিতে হবে।যদি তিনি কম নম্বর পেয়ে থাকেন তাতে তো কোনও অসুবিধা ছিল না।বিশ্বের বহু রাষ্ট্রপ্রধানের তো শিক্ষাগত যোগ্যতা ততটা ছিল না।তাতে তো কোনও সমস্যা হয় নি। কথায় আছে না একটা মিথ্যা ঢাকতে হাজারটা মিথ্যা বলতে হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের ডিগ্রি নিয়ে যা করলেন তা অত্যন্ত লজ্জাজনক , কোলোএ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

Scanned with OKEN Scanner

স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ভূমিকা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক।ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম এদের ভিত্তি। ১৯২৫ এ আর.এস.এস প্রতিষ্ঠিত হবার ৪০ বছর আগে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শাসনতান্ত্রিক কাজে ভারতীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য এই সংগঠন গঠিত হয়।কংগ্রেস গঠনের আগে দেশের নানা প্রান্তে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে।যার মধ্যে অন্যতম কলকাতার ইনডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা। এই সব সংগঠনের মিলিত মঞ্চরূপে কংগ্রেস গঠিত হয়।

কংগ্রেস গঠনের দুই বছর আগে ১৮৮৩ সালে আর্য সমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রয়াত হন। তিনি শ্রমের বিভাজনই বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তি বলে মনে করতেন। ফলত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে পারে এই আশঙ্কাথেকে তিনি শুধ্বি আন্দোলনশুরু করেছিলেন। তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। আর্যরা ভারতের সন্তান এই তত্ব তিনি প্রচার করেন।তাঁর মতবাদই পরবর্তী কালে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের ভিত রচনা করেছিল।যদিও তাঁর মূর্তি পূজার বিরোধিতা সনাতনপন্থী হিন্দুরা গ্রহণ করেনি। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠন গোড়া থেকেই হিন্দুত্ববাদী মতবাদকে পরিহার করে অগ্রসর হয়। কংগ্রেস প্রথম থেকেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ পরিত্যাগ করে।কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর The Nation in making গ্রন্থে জাতি গঠন পর্ব ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রথম পর্বের বিবরণ দিয়েছেন। তা পাঠ করলেই এই বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত প্রথম তিনজন সভাপতি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, দাদাভাই নৌরজি ও বদরুদ্দীন তায়েবজি ছিলেন অহিন্দু। তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। কংগ্রেস ভারতীয় জাতিয়তাবাদের উন্মেষের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ও বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ক্রমশঃ আন্দোলনমুখী সংগঠনে পরিণত হয়।এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আন্দোলনের পন্থা নিয়ে সংঘাত উপস্থিত হয়।চরমপন্থীদের নেতারুপে লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল আত্মপ্রকাশ করেন। লালা লাজপত রায় আর্য সমাজের অনুগামী ও ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করলে তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন।কিন্তু দৃঢ়চেতা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই নেতা রুশ বিপ্লবকে সমর্থন করেন। শ্রমিক শ্রেণির প্রথম সংগঠন AITUC 'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯২০ সালে কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও লাহৌরে পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হয়ে মৃত্যু হয়।

বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজি উৎসব ও গনেশ চতুর্থী প্রচলন করেন। হিন্দু ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাগরণ ঘটান।তাঁর 'গীতারহস্যম' গ্রন্থে তিনি গীতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আবার তিনিই ১৯১৬ সালে মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার সংগে লখনৌ প্যাক্ট করেন।তাতে বলা হল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে আইন সভা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের যেমন সংরক্ষণ থাকবে , তেমনই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে একইভাবে সংরক্ষণ থাকবে হিন্দুদের জন্য ।তিলকের মতে দেশে এখন তিনটি নয় ,দুটি পক্ষ থাকবে। এক দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হিন্দু মুসলমানসহ ভারতীয়রা।এর ভিত্তিতে ১৯১৬ সালে শুরু হয়ণী৩৯; হোম রুলণী৩৯; আন্দোলন।যার নেতা ছিলেন তিলক , জিন্না ও অ্যানি বেসান্ট। তিলক সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বলতো 'Father of Indian unrest ' লোকমান্য তিলকের বিখ্যাত উক্তি 'Swaraj is my birthright'১৯০৮ সালে তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় দুই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকিকে সমর্থন করায় তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের (Sedition) অভিযোগ আনা হয়।বিচারে তাঁর ৬ বছর কারাদণ্ড হয়। এই বিখ্যাত মামলায় তাঁর আইনজীবী ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিলক বার্মার মান্দালয় জেলে ৬ বছর বন্দী ছিলেন। ভি.আই.লেনিন 'ইস্করা' পত্রিকায় তিলকের এই কারাদণ্ডের সমালোচনা করেন। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট তিলক প্রয়াত হন।

ডা. বি এস মুঞ্জে

ডা.বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে প্রথম জীবনে তিলকের শিবাজী উৎসব ও গণেশ চতুর্থী ইত্যাদি কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন।তিলকের মৃত্যুর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধিজির ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করেন। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেননি। ডা.মুঞ্জে ১৯৩১ ও ১৯৩২- এ প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন ও ব্রিটিশের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩১ এ প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ফেরার পথে তিনি ইতালি যান ও নাৎসি নেতা সেনর মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন। মুঞ্জে নাৎসিদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন ও দেশে ফিরে তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩৩ সালে হিন্দু মহাসভা মুঞ্জের সভাপতিত্বে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৭ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার দায়িত্বভার বিনায়ক দামোদর সাভারকরের হাতে তুলে দেন।

Scanned with OKEN Scanner

লোকটি আবার ? গত ২০ জানুয়ারি দায়িত্ব নিয়ে তিনি একের পর এক যেসব সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন তাতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানেরা প্রমাদ গুনছেন। বানিজ্য শুল্ক তার একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে গত বছরের বানিজ্যের পরিমাণ ছিল মোট ১২৯২০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৮৭৪০ কোটি ডলার, আর আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে ৪১৮০ কোটি ডলারের পণ্য। বানিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪৫৭০ কোটি ডলার। এই ঘাটতি কমাবার জন্য ট্রাম্প খেপে উঠেছেন। মোদী ভাবছেন বন্ধুত্বের পাঁচালি সামনে রেখে এই অবস্থার সুযোগ নিতে। এটা বিশ্ব বানিজ্য রাজনীতিতে এখন কোনভাবেই যে সম্ভব নয় তা তাকে কে বোঝাবে। ভারতের শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি যে নেহেরু থেকে ইন্দিরার সময় পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল তার কিছু পরিবর্তন দরকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজীব,নরসীমা বা মনমোহনের সময় যেভাবে এই নীতির ধীরে ধীরে বদল হয়েছে তা ঠিকঠাক অনুসরণ না করার কারণে আজ আমাদের ট্রাম্প চূড়ান্ত অপমান করতে সাহস পাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতার দুই দশক পর তখন সবে আমরা ধীরেধীরে আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছি।আমেরিকা তখন মহাশক্তিধর রাষ্ট্র। বাংলাদেশ তৈরীর বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসনের হুমকির কাছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মাথা নত না করে সারা বিশ্বকে আমাদের মেরুদণ্ড যে কতটা শক্ত তা জানান দিয়েছিলেন।

আর আমাদের বর্তমান ৫৬ ইঞ্চি ছাতিওয়ালা প্রধানমন্ত্রী যিনি কিনা চিন ভারতের প্রায় ২০০০ বর্গ কিমি জায়গা দখল করার পরেও বলেন কেউ আমাদের জায়গায় দখল করে নেই।চিনের নাম পর্যন্ত করার সাহস নেই। অথচ সেনা বলছে চিন আমাদের বিভিন্ন এলাকা শুধু দখল করে আছে তাই নয়। বিভিন্ন কৌশলগত পয়েন্টে ঘাঁটি তৈরী করেছে, ভারতের বিভিন্ন এলাকা নিজেদের দেশের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে বসে আছে। তারা জানে ভারতে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন যার মেরুদণ্ডটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ ট্রাম্প যে পর্দা ফাঁস করার কথা বলছে সেটা কি তা দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমরা জানতে চাই। এর যথাযথ উত্তর দেশবাসী আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। হতে পারে ট্রাম্পের পাশে বসে মোদীর সেই সাহস হয়নি। অন্তত দেশে ফিরে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে তো জবাবটা দিতে পারতেন। তা না করে রহস্য সৃষ্টি করার কারণ কি ?

ওয়াশিংটন যখন ভারত থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্কের হার বাড়াচ্ছে তখন তো কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পিযুষ গয়াল চুপি চুপি আমেরিকায় পৌঁছে প্রসাশনের বিভিন্ন স্তরে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন।সেসময় ভারত আমেরিকার মধ্যে কি কি চুক্তি হয়েছিল বা কি কি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে কি কি মানা হয় নি ও কি কি প্রস্তাব মানা হয়েছে তা কেন খোলসা করে বলা হচ্ছে না ? বাজেটে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পণ্য যেমন হারলে ডেভিডসন মোটরসাইকেলের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে।বোরবন হুইস্কির ওপরও শুল্ক বেশ কিছুটা কমানো হয়েছে। এখন ট্রাম্পের হুমকিতে আরও কি কি গোপনে করা হয়েছে তা যদি না জানানো হয় তাহলে সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না। মোদীর সফরের সময় আমেরিকায় মোদীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মোদীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌতম আদানির সম্পর্কে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা। গৌতম আদানি আমেরিকায় ঢুকলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এই মর্মে আমেরিকার একটি আদালতের রায় আছে। ঐ দেশে প্রতারণার শাস্তি বেশ বেশী। গৌতম আদানি সেই অপরাধে দোষী। ফলে তার জন্য যে মোদী ট্রাম্পের সঙ্গে কোন ডিল করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর সেটা যে যথেষ্ট গোপনেই করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। গৌতম আদানি মোদীর মদতে বহু খারাপ কাজকর্ম করেছেন বিগত দুই দশক ধরে। বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে অকাতরে টাকা ঢালা বা কংগ্রেস শাসিত একাধিক রাজ্যে সরকার ভাঙা।সবই তাদের দেশের মানুষের সঙ্গে জালিয়াতি করা টাকায়। কিন্তু মোদী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন ? এটা নাকি একান্তই ব্যাক্তিগত বিষয়। আমরা তো জানি মোদী আদানি দুষ্টচক্র বিজেপির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। নির্বাচনী বন্ডের পর্দা ফাঁস হওয়ার পর দেশের মানুষ নিশ্চয় কিছুটা বুঝেছেন কেন কয়েকটি ওষুধের কোম্পানির তৈরী ওষুধগুলোর দাম এতটা বাড়ানো হল। অথবা দেশজুড়ে জাল ও নিম্নমানের ওষুধের ছাড়পত্র কেন দেওয়া হয়েছে,কার স্বার্থে দেওয়া হয়েছে।

আবার দেখুন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের লন্ডনে দেওয়া বিবৃতি। তিনি বললেন ট্রাম্পের নীতি নাকি ভারতের পক্ষে ভাল। অথচ হিসাব কষে দেখা গেছে ট্রাম্প নীতির ফলে ভারতের বছরে ৭০০০ কোটি ডলার লোকসান হবে। আমেরিকা ভারতের কৃষিবাজারে ঢুকতে চায়। সেক্ষেত্রে দেশের কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করলে চলবে কি করে। মোদী সরকার তাদের বিশ্বাস করছে না,প্রধান বিরোধী দলকে বিশ্বাস করছে না,দেশের ১৪০ কোটি মানুষকে বিশ্বাস করছে না। তাহলে কাদের জন্য সরকার ? আমেরিকার বানিজ্য সচিব ইন্ডিয়া টুডের কনক্লেভে সবার সামনে বলছে ভারতকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। ধমক আসার আগেই তো মোদী ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেলেন। তাহলে আর বাণিজ্য যুদ্ধটা করবেন কি করে ? মোদীকে পাশে বসিয়ে একের পর এক ঘোষনা একতরফা ভাবে করে গেলেন ট্রাম্প। তিনি বলে দিলেন যে ভারতকে কোটি কোটি ডলারের এফ ৩৫ যুদ্ধবিমান সহ সমরাস্ত্র বিক্রি করবে আমেরিকা। প্রয়োজন না থাকলেও ভারতের জনগনের দেওয়া করের টাকা এভাবেই নষ্ট করার হক মোদীকে কে দিল। একইসঙ্গে বছরে হাজার কোটি ডলারের তেল ও গ্যাস অর্থাৎ পেট্রো পণ্য কিনতে হবে আমেরিকার কাছ থেকে। এছাড়া অনেক কিছু ভারত নিজেই তৈরী করতে পারে জোর করে আমেরিকা বেচবে ভারতকে। এভাবেই ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যেতে চায় আমেরিকা। আর মোদী জয়শঙ্কর যখন দোস্তি দোস্তি করে চলেছেন তখন ট্রাম্প তাদের সঙ্গে কি ধরণের বন্ধুকৃত্য করছেন তা একটু নজরে রাখতে হবে। নেপালের বেআইনী

Scanned with OKEN Scanner

ডা. হেডগেওয়াড় ও আর এস এস প্রতিষ্ঠা

ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়াড় কলকাতার ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক। ডা. মুঞ্জে তাঁকে ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রভূত সহায়তা করেন। ডাক্তারি পড়া শেষ করে ডা. হেডগেওয়ার ১৯১৫ সালে নাগপুরে এসে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ইদানিং সংঘ পরিবার থেকে বলা হচ্ছে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গান্ধিজির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর জীবনীকার সি.পি.ভিসিকর লিখেছেন,'ডাক্তার সাহেব মনে করতেন যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে 'যবন সর্প' (পড়ুন মুসলমানরা) তার বিষাক্ত ফনা বিস্তার করেছে।এই আন্দোলন সমাজ জীবনে অশুভ শক্তির জন্ম দিয়েছে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করেছে ও তার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। 'মালাবার উপকূলের মোপলাদের (মুসলমান কৃষকদের) ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার বলে বর্ণনা করেন।

১৯১৬ সালের লখনৌ চুক্তি ও ১৯২১ এর যুক্ত অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে উঠেছিল।এই ঐক্য সব চাইতে বেশি শঙ্কিত করেছিল বৃটিশরাজও তাদের সহযোগী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে।অসহযোগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার নিম্নবর্ণের মানুষ যোগ দিতে থাকায় তাঁদের চেতনার মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সঙ্গে গান্ধিজির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক উচ্চবর্ণের মানুষদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন ডা. মুঞ্জে, ডা. এল ভি পরাঞ্জপে, ডা.বি বি থালকার, বাবুরাও সাভারকর (বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাই), ডা.হেডগেওয়াড় এই পাঁচ জন মিলে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।প্রথম চারজন ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা এবং এঁরাও ইতিমধ্যে হিন্দু স্বয়ংসেবক সমিতি ও হিন্দু সংরক্ষণ সমিতি নামক শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ওই দিনের সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কোনো সংঘর্ষ হলে নিজেদের প্রতিরক্ষা বিধান করতে সক্ষম নন। তারা নির্ভর করেন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপর। তাই উচ্চবর্ণের হিন্দু সন্তানদের শৈশবেই এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ও তাদের শারীর শিক্ষা ও কসরৎ শেখাতে হবে যথা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বর্ষা ছোঁড়া ইত্যাদি।প্রথম থেকেই এই সংগঠন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, বানিয়া ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের ছেলেদের নিয়ে গড়ে ওঠে। ১৯২৬ এর বিজয়া দশমীর দিন ওই সংগঠকরা আবার মিলিত হয়ে সংগঠনের নামকরণ করেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ'।

ডা. হেডগেওয়াড় ও অন্যান্যরা মনে করেন 'রাষ্ট্রীয়' অর্থাৎ 'হিন্দুত্ব' সমার্থক। সংঘওরাষ্ট্রের পতাকা হবে গৈরিক যা প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে ছত্রপতি শিবাজী বহন করতেন। শিবাজীকে তাঁর গুরু রামদাস এই গৈরিক পতাকা দিয়েছিলেন বলে সংঘ পরিবারের সদস্যরা মনে করেন। এরা এই গৈরিক পতাকাকে 'ভাগোয়া'; ঝান্ডা বলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই আর.এস.এস এর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিলনা তা ডা.হেডগেওয়াড়ের বক্তৃতা, সংঘের ইতিহাস ও পরবর্তী সরসংঘ চালক এম. এস. গোলওয়ালকরের লেখাপত্র পড়লেই জানা যায়। এঁরা মনে করতেন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনও দ্বন্দ্ব নেই, দেশে প্রধান দ্বন্দ্ব হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের। তাদের কর্মপদ্ধতি তারা সেইভাবেই নির্ধারণ করেছিল।লাঠি-সোটা নিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা যায় না তা আর.এস.এস. ভালোই বুঝতো।সংঘের পোশাক ছিল খাঁকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট, মাথায় কালো টুপি। মিলের কাপড়।সংঘ কখনো বিলাতি বস্ত্র বয়কটের ডাক দেয়নি।চরকা ও খাদির সঙ্গে আর এস এস-এর কোনও সম্পর্কই ছিলনা। পুলিশের মতন পোশাক করা হয়েছিল জনসাধারণের মনে যুগপৎ ভয় ও সমীহ সৃষ্টির জন্য।স্থানীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় সংঘ সদস্যরা যাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এখনও হয়। ১৯২৬-১৯২৭ সাল থেকেই দেশের নানা প্রান্তে মানুষ নানা পদ্ধতিতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতে থাকে। ভারতবাসীকে কতটা শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া যায় তাই খতিয়ে দেখতে ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন আসে ভারতে। এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিল শ্বেতাঙ্গ। প্রতিবাদে কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কটের ডাক দেয়। সারা দেশজুড়ে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা ও আর এসএস যোগ দেয়নি। সংঘের ইতিহাসে অবশ্য ১৯২৭ সালে নাগপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আর.এস.এস কীরকম বীরত্ব দেখিয়েছিল তার বর্ণনা আছে। (পরের সংখ্যায়)

মোদী কি আদানিকে বাঁচাতে ট্রাম্পের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন

শুভ মিত্র

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রিয় বন্ধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন অবশেষে কেউ ভারতের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। এই কেউটি যে তিনি নিজেই তা তিনি উহ্য রেখেছেন। এবারে আমেরিকায় ট্রাম্প জেতার পর সারা বিশ্ব নড়ে চড়ে বসেছে। যিনি একদা সরকারী অফিস দখল করে আগুন লাগানোতে মদত দিয়েছিলেন শুধুমাত্র গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন বলে,সেই

Scanned with OKEN Scanner

অভিবাসীদের দেশে ফেরানো হল তাদের পাঠানো বিমানে, হাত পায়ে কোন শিকল ছাড়াই। কিন্তু ভারতের বেআইনী অভিবাসীদের ভারতে ফেরানো হল হাত পা শৃঙ্খলিত করে। মোদী কি একবারও এবিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন? নাকি তা করা সত্ত্বেও ট্রাম্প তা আমল দেন নি,মোদীর বন্ধুত্বকে স্বীকার করেন নি? বিদেশ দপ্তরের কর্তা রনধীর জয়সওয়াল প্রসংগ এড়িয়ে গিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন দুপক্ষ এবিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করছে। ট্রাম্পের ঘোষণার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। আর মোদী তখন কোথায়? কখনও মা গঙ্গার অনুষ্ঠানে বা কোন বিয়েতে আনন্দ করছেন। আবার ককনও বা সুরাটে গিয়ে রোড শো করে বেড়াচ্ছেন। যেখানে বছর দুয়েকের মধ্যে কোনও নির্বাচন নেই। কোন সুরাট? যেখানে গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর পর আটজন নির্দল প্রার্থীদেরও ভোটের ময়দান থেকে সরিয়ে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থী। আবার মোদীকে কখনও বা দেখা গেল আনন্দ অম্বানীর চিড়িয়াখানায় কাঁচের এপার থেকে অপর দিকে থাকা সিংহ বা বাঘের দিকে বীর বিক্রমে তাকিয়ে আছেন। আসলে তিনি জানেন যে মানুষ কদিন পরেই এসব ভুলে যাবেন। হোয়াইট হাউসে একটা অতি ক্ষুদ্র দেশ ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী জেলেনিস্কি ট্রাম্পকে জবাব দিয়ে নৈশভোজ না করেই বৈঠক ত্যাগ করেছিলেন। আর আমরা মাথা নামিয়ে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এলেন।

কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ গুলি একটু লক্ষ করুন। হোয়াইট হাউসে মোদী ইলন মাস্কের শিশুদের সঙ্গে খেলা করছেন এরকম একটা ছবি সবাই দেখেছেন। তার পরেই দেখা গেল ইলন মাস্কের টেসলা গাড়ীর জন্য শোরুম ব্যাবস্থা হয়ে গেল।আবার মাস্কের দ্রুতগতি সম্পন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী স্টারলিংক জিও প্লাটফর্ম ও এয়ারটেলের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলল। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেই এই স্যাট নেট পরিষেবা দিতে স্পেকট্রাম বন্টন নিয়ে এই স্টারলিংকের সঙ্গেই তর্কে জড়িয়েছিল দেশীয় টেলি সংস্থাগুলি। তার মধ্যে এয়ারটেল জিও সবাই ছিল। তাই এই দুটি সংস্থার সঙ্গে আচমকা গাঁটছড়া বাধায় যে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এবং এবারে যে আবার টেলিমাশুল অনেকটাই বেড়ে যাবে তা সময়ের অপেক্ষা।

মনমোহন সিং সরকার যখন আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করেছিল তখন তার আগে সংসদের ভেতরে ও বাইরে দেশজুড়ে বিতর্কের আয়োজন করেছিল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার। দেশের মানুষকে বা বিরোধী দলগুলিকে অন্ধকারে রেখে এই চুক্তি করা হয় নি।এর ফলে বামেরা সমর্থন প্রত্যাহার পর্যন্ত করেছিল।সরকার পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়ে গেলেও কংগ্রেস দেশের মানুষের কাছে সৎ ছিল। এটারই অভাব বর্তমান মোদী সরকারের।

Scanned with OKEN Scanner